বিভিন্ন সময়িক-পত্রে প্রকাশিত
কাহিনীগুলির সমষ্টি মাত্র,
ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন।

১২ই পৌষ,
সন ১৩৩৫।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয়—

অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভক্তিভাজনেষু

সূচি

থার্ডক্লাশ

হলুদ রঙের একখানা গাড়ী। বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি, ভাঙ্গা রঙ-ময়লা গণ্ডা পাঁচেক ট্রাঙ্ক, দশ বারোটা ঝুড়ি, গোটা বিশেক ক্যাম্বিসের ব্যাগ, খান চব্বিশ দেশী ও বিলাতী কম্বল, পাঁচ সাতখানা ছেঁড়া কাঁথা, অগণ্য হুঁকা-কলকে, পানের ডিবে ও জলের গেলাশ। তার মাঝে মাঝে জুতা—পম্পসু, চটি, ডার্বি, নাগরাই, ক্যাম্বিস্, চীনেবাড়ী, তালতলা, টেন্‌ঠেনে, কটক, আগ্রা সকলেরই নূতন পুরাতন নমুনা একসঙ্গে।

গাড়ীর ভিতরে মাথার কাছে লেখা, "চব্বিশ জন বসিবেক।" চব্বিশ জনের জন্য সাড়ে চারখানা বেঞ্চ। তার আধখানা কলেক্টর সাহেবের আর্দ্দালীর দখলে। বেঞ্চের ভিতরের ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ কোটি ছারপোকা, আর তার উপরের একচল্লিশ জন স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, শিশু ঠাসাঠাসি। পাগ্‌ড়ী, টুপী, তাজ, আলখাল্লা, গেরুয়া, নেংটী, শাড়ী, থান, রসগোল্লা পাড় ও কাশী পাড় কাপড়, পায়জামা ও আচকানের বিচিত্র সমন্বয়।

দুর্গন্ধ! পায়খানার দরজা দড়ি দিয়ে বাঁধা, হুক্ নেই। একটা বেঞ্চের নীচে একটা মরা ইঁদুর, আর একটা বেঞ্চের নীচে কতক-গুলো অনেক দিনের পচা কলার খোসা। তামাক, বিড়ি, সিগারেট্, গাঁজা, নারিকেল ও ফুলেল তৈল, ময়লা কম্বল ও কাঁথা,

কাবুলীর বোঁচকা ও কলেক্টর সাহেবের আর্দ্দালীর ছিপিখোলা 'রমের' বোতল। সকলের দুর্গন্ধ একসঙ্গে।

ভাদ্রের গ্রীষ্ম। ছোট ছোট ছেলেদের ক্রন্দন। একটু হাওয়ার জন্য একটি জানালা দিয়া একসঙ্গে তিন চারজন যাত্রীর মুখ বাহির করিবার প্রয়াস। এই অবস্থায় ঘোম্‌টার আবরণে ঘর্ম্মাক্ত যুবতী সতর্ক অঞ্চল বীজনে শীতল হইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। কোণে একটা বুড়ী সমস্ত অঙ্গের সঙ্গে পা দু'টী গুটাইয়া জ্বরের ঘোরে ধুঁকিতেছিল।

টুং! টুং! টুং! ফুঁ!

ষ্টেশন। 'চাই মিঠাই', 'চাই পান-বিড়ি!' 'এই কুলি এধার!'

'এধার কোথায়? দেখছ না ভর্ত্তি? ওধার যাও!'

'গার্ড সাহেব!'

'ইউ ড্যাম্‌!'

'ও টিকিটবাবু, উঠ্‌বো কোথায়?'

'ইস্‌মে ওঠনা কেন?'

'উঠতে দেয় না যে!'

'কেন নেহি দেঙ্গে? গাড়ী উস্‌কো বাবার নাকি? উঠ জল্‌দি! হ্যালো গুডমর্ণিং পেড্রুজ!' টিকিটবাবু গার্ডের গাড়ীর দিকে ছুটিলেন।

'ওঠ্‌ ওঠ্‌ মহেশ, ঝাণ্ডি দেখাচ্ছে ওঠ্‌!'

ঘটা ং

'ওরে বাপু, এর মধ্যে!' 'এই দুটো ষ্টেশন গো—সরাও তো বাবা তোমার গাঁটরীটা। ওঃ বড় গরম!'

'ফুঁ!'

যাত্রী বর্ত্তমানে চুয়াল্লিশ।

ঘটাৎ! মাথায় টুপী, সাদা কোটপ্যাণ্ট, রক্তমুখ ফ্লাইং চেকার! শঙ্কিত যুবতী সরিয়া গেল। দু'পা সরিয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া চেকার দাঁড়াইয়া সম্মুখের বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া হাঁকিল, 'টিকেট ডেখ্লাও!'

'দেখাই সাহেব।'

'জল্‌ডি নিকালো—এই হটো ড্যাম্! পায়ের কাছের হিন্দুস্থানী বালক সভয়ে সরিতে গিয়া পড়িয়া গেল।

'টুমকো টিকিট?'

'করতে পারিনি সাহেব, দাসপুর যাব।'

'টিকিট নেহি কিয়া? লে আও রূপেয়া! জল্‌ডি নিকালো!'

'দিচ্ছি সাহেব, এই সাত আনা।'

'নেহি হোগা ডেও রূপেয়া!'

লোকটি গামোছার খুঁট খুলিয়া আরো চার আনা বাহির করিয়া দিল। এই ছিল তার মোট সম্বল।

'আউর ডেও।'

'আর কোথায় পাব সাহেব? আট আনা টিকিটের দাম, এগারো আনা দিলাম—আর পয়সা নেই।'

'আট আনা মাশুল, আউর আট আনা জরিমানা।'

'এবারের মত মাফ কর সাহেব !'

'বহুট্ আচ্ছা, এ্যাসা কব্‌ভি মট্ করো। এই হটো, যানে ডেও। এই মাগি'—বলিয়া ত্রস্ত যুবতীকে কনুই দিয়া ধাক্কা দিয়া বৃদ্ধার পা মাড়াইয়া সাহেব বাহির হইয়া গেল।

'বাবা গো মলাম !' বৃদ্ধার আর্ত্তনাদ।

'সাহেব, আমার মাশুল নিলে, টিকিট ?'

'মট্ চৌল্লাও !' সাহেব অন্য গাড়ীতে ঢুকিল।

'বলদপুর !' 'বলদপুর !!' ষ্টেশনের পোর্টার হাঁকিল। আবার সেই হট্টগোল। গাড়ীতে উঠিবার জন্য যাত্রীদের সেই দারুণ প্রয়াস ! ষ্টেশন মাষ্টারের বিচিত্র হিন্দী, রেলের কুলীর গালাগালি। থার্ডক্লাশের যাত্রীযূথের কোলাহল ও আর্ত্তনাদ।

'এই ঘণ্টি দেও !' ষ্টেশন মাষ্টার হাঁকিলেন।

'দাঁড়াও বাবা ! ও-সাহেব বাবা, একটু রাখ বাবা !' বলিতে বলিতে পুঁটুলীহাতে এক বুড়ী আসিয়া গাড়ীর কাছে দাঁড়াইল।

'হঠো বুড়ী ! ছোড় দিয়া।'

বুড়ী মিনতি করিয়া কহিল, 'আমার বিপিন বাঁচে না বাবা, সকালে এসেছিনু বদ্দিবাড়ী, অষুধ নিয়ে যাচ্ছি।' বলিয়া সে গাড়ীতে উঠিতেই টিকিটবাবু তাহাকে ধরিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বুড়ী হাতের পুঁটুলী প্ল্যাটফরমে ছুঁড়িয়া দিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, 'ওরে বিপিন রে !' গাড়ীর শব্দে বাকী কথাগুলি শোনা গেল না।

গাড়ী চলিতেছে। গাড়ীর জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিলে কতক্ষণে অন্ধকূপ হত্যার পুনরাভিনয় হইতে পারে তাহাই ভাবিতেছি এমন সময় গাড়ী থামিল। তৃষ্ণার্ত্ত যাত্রীর দল সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'পানি-পাঁড়ে, এই পাঁড়ে!' সঙ্গে সঙ্গে আশে-পাশের পঞ্চাশটি জানালার মধ্য দিয়া দেড়শ' শূন্য ঘটি, গেলাস, বাটি ও মগ বাহির হইয়া আসিল।

'এই পানি-পাঁড়ে! এ-ধার!'

কালো বালতি হাতে কৃষ্ণবর্ণ, নগ্নপদ, টুপী মাথায় পানি-পাঁড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁত খিঁচাইয়া কহিল—'এ-ধার! হুকুম্‌সে পানি মিলেগা?' তারপর মৃদুস্বরে কহিল, 'এক এক লোটা, দো—দো পয়সা।' বাঁ-হাতের মুঠা পয়সায় ভরিয়া, ডান-হাতে শূন্য বালতি লইয়া পানিপাঁড়ে মহাশয় ফিরিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় কালেক্টর সাহেবের আর্দ্দালী তন্দ্রা ভাঙিয়া হাঁকিলেন, 'এই পাঁড়ে পানি লে আও।' রক্তচক্ষু পাঁড়েজী মুখ ফিরাইলেন। তারপর দীর্ঘশ্মশ্রু,উষ্ণীষ-শোভিত আর্দ্দালিসাহেবকে দেখিয়া হাতের বালতি নামাইয়া রাখিলেন ও সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিলেন, 'সেলাম হুজুর। থোড়া সবুর কিজিয়ে, টাট্‌কা পানি লে আতে হেঁ।'

বীরদর্পে আর্দ্দালী সাহেব স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া গোঁফে তা দিতে লাগিলেন।

দশ মিনিট থাকিবার কথা; বিশ মিনিট হইয়া গেল গাড়ী ছাড়ে না। গ্রীষ্মের জ্বালায় প্ল্যাট্‌ফর্মে নামিলাম। পোর্টার আসিতেছিল।

'ওহে, গাড়ী ছাড়তে এত দেরী হচ্ছে কেন বলতে পার ?'

'নেহি জান্‌তা।" পোর্টার চলিয়া গেল।

টিকিট চেকার আসিতেছেন।

'চেকারবাবু, গাড়ীর দেরী হচ্ছে কেন ?'

'কেডী সাহেবের লেডি (!) খানা খেতে গেছেন।'

'কেডী সাহেব কে ?'

'হোয়াট্‌ ফ্রট্‌ ইওর নোয়িং ?' আমার জানিয়া কোন ফল নাই বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

চেকার চলিয়া গেলেন।

শূন্য বোতল ঘটর্‌ ঘটর্‌ করিতে করিতে সোডাপানিওয়ালা আসিতেছিল।

'মিঞা, কেডী সাহেব কে বলতে পার ?'

'নীলগঞ্জের পাটের দালাল। সেকেন ক্লাশে আছেন।'

কেডী সাহেবের 'লেডী' আসিলেন, ষ্টেশন মাষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। গার্ড সাহেব ষ্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিশান তুলিলেন, গাড়ী ছাড়িল।

আমার কাণে হঠাৎ বাজিল, বুড়ীর সেই আর্ত্তনাদ,—'দোহাই বাবা, একটুখানি রাখ বাবা ! ওরে বিপিন—বিপিন রে— !'

আপেল

সোমবারের সকালবেলা উঠিয়াই ছয় বৎসরের ছেলে বুধা ঘুমন্ত পিতার কাণে কাণে কহিল, "বাবা আজ সোমবার—আজ আনবে বাবা ?"

নটবর ছেঁড়া মাদুরখানার উপরে একবার পাশমোড়া দিয়ে নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে কহিল "আনব।" বালকের সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহিরে গিয়া তাহার সমবয়সী বড়বাড়ীর ছেলে শ্রীকান্তকে ডাকিয়া কহিল, "আজ বাবা আনবে বলেছে, দেখিস সন্ধ্যেবেলা।"

পিতা-পুত্রের এই গোপন পরামর্শের বস্তু ছিল একটা আপেল। সেদিন শ্রীকান্ত রাস্তায় দাঁড়াইয়া একটা রক্তবর্ণ ফলে মহা উৎসাহে দন্তভেদ করিতেছিল, বুধা অনেকক্ষণ ধরিয়া দরজার ছেঁড়া চটের আবরণের মধ্য দিয়া শ্রীকান্তের এই ভোজনলীলা দেখিল, তাহার পর যখন লোভ সামলানো দুঃসাধ্য হইল তখন বাহিরে আসিয়া শ্রীকান্তকে কহিল, "কি খাচ্ছিস রে ছিরিকান্ত ?" শ্রীকান্ত নির্ব্বিকারচিত্তে কহিল, "আপেল"। বুধা কহিল, "আমাকে এক কামড় দেনা ভাই!"

শ্রীকান্ত ফলটির শেষ অবশেষটুকু তাড়াতাড়ি গালে পুরিয়া কহিল, "উঁহু!" তারপর চর্ব্বণ সমাপ্ত করিয়া কহিল "আমার বাবা এনে দিয়েছে, তোর বাবা কেন এনে দেয় না রে ?"

সাড়ে বাইশ টাকা মাহিনার কেরাণীর ছেলে পাঁচ শত টাকা মাহিনার পুত্রের এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। সে কাঁদ কাঁদ মুখে পিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। নটবর তখন ছেঁড়া কামিজটির উপর পাট করা মলিন চাদরখানা জড়াইয়া ন'টার গাড়ী ধরিবার উদ্দেশে যাত্রা করিতেছিলেন, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বুধা কহিল, "বাবা আমাকে একটা আপেল এনে দিও।" "আচ্ছা" বলিয়া নটবর বাহির হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যার গাড়ীতে নটবর যখন আপিস হইতে ফিরিতেছিলেন তখন রাস্তার মোড়ে বুধার সহিত দেখা হইল। অন্যদিন বুধার এতক্ষণ দুপুর রাত, আজ আপেলের লোভে আর সে ঘুমাইতে পারে নাই। মাতা জোর করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন বটে কিন্তু সন্ধ্যার গাড়ী যখন বাঁশীর শব্দ করিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিল তখন সে নিদ্রার ভাণ ত্যাগ করিয়া রান্না-ঘরের দিকে সভয়ে চাহিয়া একেবারে পথে গিয়া উপস্থিত হইল। পিতাকে দেখিয়াই ডান-হাতখানি প্রসারিত করিয়া কহিল, "বাবা, আমার আপেল?" নটবর কহিলেন, "ওঃ যাঃ! ভুলে গেছিরে বুধা, কাল দেব।"

মুহূর্ত্তে বুধার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল, একটি ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল. "আচ্ছা।" নটবর সত্য কথা বলেন নাই। পথে যাইতে আপেলের দোকান দেখিয়া বুধার ফরমাইসের কথা মনে হইয়াছিল কিন্তু পকেটে একটিও পয়সা ছিল না। দারোয়ান

রামশরণ সিংহের কাছে চারি আনা পয়সা ধার চাহিয়া কিছু পান নাই। কাল কোথা হইতে চারি আনা জুটিবে তাহা নটবর জানিতেন না, শুধু নিরাশ পুত্রকে আশ্বাস দিবার জন্য আবার এই প্রতিজ্ঞা করিলেন।

তার পর দিনও বুধা সমস্ত দিনমান সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় কাটাইল। আজ যে আপেল আসিবে তাহাতে তাহার সন্দেহ মাত্র ছিল না। বাহিরের দ্বারের পাশে সে দাঁড়াইয়াছিল, দূর হইতে পিতাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "বাবা আপেল দাও।" নটবর ক্ষণেকের জন্য মুখ বিকৃত করিলেন তাহার পর পকেটে হাত দিয়াই বলিলেন, "এই রে! সেটা বুঝি পড়ে' গেছে। হ্যাঁ তাই তো!" এ উপায় ছাড়া আজ আর বুধাকে প্রবোধ দেওয়ার অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু এই ছলনাটুকু করিতে নটবরের চোখ ফাটিয়া জল আসিল।

বুধা পিতার হাত ছাড়িয়া দিল। তারপর সঙ্গ ছাড়িয়া সম্মুখে গিয়া আবার ফিরিয়া কহিল, "হ্যাঁ বাবা, সেটা কত বড় ছিল?"

নটবর অঙ্গুলিগুলি বিস্তার করিয়া একটা কল্পিত পরিমাপ দেখাইয়া দিলেন।

বুধা কহিল, "উঃ খুব বড় ত বাবা! আচ্ছা বাবা আবার কাল আনবে?"

পরশু সোমবার মাহিনার দিন। নটবর কহিল, "কাল না বাবা, সোমবার আনব।"

বুধা প্রশ্ন করিল, "সোমবার কবে বাবা ?"

"কালকের দিন বাদ সোমবার । দুটো এনে দেব ।"

মহা উল্লাসে বুধা কহিল, "অমনি বড় আর লাল এনো বাবা ?"

নটবর কহিলেন, "আচ্ছা ।"

বুধা নাচিতে নাচিতে বাড়ীর উঠানে গিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "মা, বাবা আমায় দুটো আপেল এনে দেবে, জানো ? খুব বড় !"

রন্ধনশালা হইতে বুধার মাতা স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেখছ ? না পেতেই এই, পেলে যে কি করবে খোকা !"

বৌবাজারের মোড়ে দাঁড়াইয়া এক কাবুলির দোকানে নটবর বাছিয়া বাছিয়া দু'টি বড় আপেল পছন্দ করিয়া দাম স্থির করিয়া খাঁ সাহেবকে কহিলেন, "এ দুটো আলাদা করে রেখে দিও, ফেরবার পথে নিয়ে যাব ।"

দোকানের সেরা আপেল দু'টি। অনেক দিনের প্রার্থিত ফল দু'টি পুত্রের হাতে দিলে তাহার মুখে যে পুলকের হাসিটুকু দেখা দিবে, কল্পনায় তাহা দেখিয়া নটবর দত্তের শীর্ণ মুখখানি উল্লাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ।

বেলা তিনটা বাজিতেই মাহিনার বিল লইতে নটবর উঠিয়া বড়বাবুর ঘরে গেলেন। বড়বাবু বিলখানা নটবরের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। বিল দেখিয়াই নটবরের বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল। বিলের পাশে কাজ সম্পূর্ণ না করিবার অজুহাতে নটবর দত্তের মাহিনা দেওয়া স্থগিত রাখিবার হুকুম লেখা ছিল।

লাল পেন্সিলের এই ইংরাজী অক্ষর কয়টা যেন হাতুড়ী দিয়া তাঁহার বুকের পাঁজর কয়খানি একেবারে চূর্ণ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভগ্নকণ্ঠে নটবর কহিলেন, "বড়বাবু—"

বড়বাবু কহিলেন, "আমি কিছু করতে পারব না মশাই, সাহেব বড় কড়া লোক জানেন তো? আপনি সাহেবের কাছে যান।" বিলখানি তুলিয়া লইয়া নটবর আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে বড় সাহেবের দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। চাপরাশি খবর দিলে ভিতর হইতে হুকুম আসিল, "কম্ ইন্!"

নটবর সুদীর্ঘ প্রণতি করিয়া কহিলেন,"হুজুর আমার মাহিনা—"

সাহেব তখন ওয়ালটেয়ারে তাঁহার পত্নীকে আগামী বড়দিনের উপহার পাঠাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, তাঁহার সকল কথা শুনিবার সময় ছিল না, ইংরাজীতে কহিলেন, "হবে না। কাজ ফাঁকি দিলে আমার কাছে কোনও মাফ নেই। যাও।"

নটবর কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "হুজুর। কালই সারা রাত খেটে সব শেষ করে' দেব।"

সাহেব চিঠি হইতে কলম তুলিয়া কহিলেন, "তা হ'লে পরশু মাইনে পাবে।"

"হুজুর, একটা টাকা, অন্ততঃ আট আনা পয়সা দেওয়ার হুকুম—"

"নট্ এ ফার্দ্দিং! যাও—" বলিয়া ফলের দুইটী ঝুড়ি টেবিলের উপর তুলিয়া লেবেল আঁটিয়া দিলেন "ফর হ্যারি" "ফর নেল।"

হ্যারী সাহেবের পুত্র ও নেলী কন্যা ; উভয়ে তখন মাতার সহিত স্বাস্থ্যাবাসে ছিল।

একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নটবর বাহির হইয়া আসিলেন এবং বিলখানি বড়বাবুর হাতে দিয়া কহিলেন. "কিছু হোলো না।" একবার মনে হইল বড়বাবুর কাছে একটা টাকা ধার চাহিয়া লইবেন। কিন্তু হঠাৎ যেন সমস্ত জগৎটার উপর কেমন ঘৃণা জন্মিয়া গেল, ইচ্ছাটা কাজে পরিণত করিবার আর প্রবৃত্তি হইল না। সমস্ত পথ মনে পড়িতে লাগিল বুধার কথা। কাল রবিবার সমস্তটা দিন বুধা তাঁহাকে তাঁহার সোমবারের প্রতিশ্রুতির কথা মনে করাইয়া দিয়াছে ; সে বেচারা যে আজ সারাদিন পথের দিকে চাহিয়া থাকিবে সে বিষয়ে তাঁহার সংশয় ছিল না। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে ষ্টেশনের রাস্তার ধারে পিতার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিলেই আগ্রহে ছুটিয়া আসিবে—তাহার পর ?

ভাবিতে ভাবিতে নটবর যে বহুবাজারের মোড়ে আসিয়া পৌছিয়াছেন সে খেয়াল আদৌ ছিল না। হঠাৎ এক ঝাঁকামুটের ধাক্কা খাইয়া তাঁহার চমক হইল। রাস্তার অপর ধারেই সেই আপেলের দোকান। ধীরে ধীরে রাস্তা পার হইয়া গিয়া দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নটবর সেই আপেল দুইটির দিকে চাহিলেন। বুধার কথা মনে হইল ; মনে হইল যেন একটী নগ্নকায় শিশু আগ্রহে হাত বাড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেছে, "বাবা আপেল ?"

আবিষ্টের মত নটবর আপেল দু'টী তুলিয়া লইলেন।

পর মুহূর্ত্তেই কে আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই চোট্টা হ্যায়।" তাহার পর আর কিছু মনে ছিল না, যখন জ্ঞান হইল তখন নটবর থানার গারদ ঘরে।

বেলা পাঁচটা হইতে বুধা ষ্টেশনের পথে দাঁড়াইয়াছিল। সাড়ে ছয়টার গাড়ী হুস্ হুস্ করিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিল, তখন আনন্দে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পর যখন যাত্রীরা পথ দিয়া চলিতে লাগিল তখন আর তাহার ধৈর্য্য রহিল না। প্রতি মুহূর্ত্তেই সে একবার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রত্যেক দূরের মানুষটিকেই পিতা বলিয়া মনে হইতেছিল, আগ্রহে অগ্রসর হইয়া পথচারীর মুখের দিকে চাহিয়া আবার সে ফিরিয়া আসিতেছিল। এমনি করিয়া এক ঘণ্টা কাটাইয়া যখন আর কেহ রাস্তায় চলিবার রহিল না তখন শুষ্কমুখে সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বাবা আসেনি মা। বাবা এলে আমাকে ডাকবে হ্যাঁ, মা ?"

ইহার পরে ন'টার গাড়ী ছিল। আজ মাহিনার দিন ; হয়তো জিনিষপত্র কিনিয়া আনিতে দেরী হইয়া গেছে ভাবিয়া হৈমবতী কহিলেন, "আচ্ছা, তুই ঘুমো এখন।"

রাত্রে যখন বুধা স্বপ্ন দেখিতেছিল যে তাহার ছেঁড়া জামার পকেট দু'টী আপেলের ভারে ফুলিয়া উঠিয়াছে, তখন দারোগা রিপোর্ট লেখা শেষ করিয়া নটবর দত্তকে চুরির অপরাধে কোর্টে উপস্থিত করিবার অর্ডার লিখিতেছিলেন।

তীর্থে

তীর্থ। অতি প্রাচীন ; বিগ্রহ জাগ্রৎ, মন্দির প্রকাণ্ড, তাহার সম্মুখে প্রশস্ত চত্বর, চত্বরের মধ্যে নাটমন্দির। নাটমন্দিরে তেত্রিশজন ব্রাহ্মণ তেত্রিশখানি কুশাসনে সারবন্দী হইয়া বসিয়া। গীতা, চণ্ডী ও শ্রাদ্ধের মন্ত্র একত্র মিলিয়া এক দুর্ব্বোধ্য শব্দলোকের সৃষ্টি করিয়াছে।

বেলা আটটা। পাণ্ডাবাড়ীর ছেলেরা স্নান সারিয়া যাত্রী ধরিবার জন্য রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া বিড়ি ফুঁকিতেছে। জবা-ফুলের মালা গলায়, মাথায় টেরী, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা বাগ্দীর দল ছুরি ধার দিতেছে। শনিবার। পাঁঠার দাম চড়িয়া গিয়াছে।

(২)

বেলা নয়টা। তীর্থ-যাত্রীর আগমন আরম্ভ হইল। ছ্যাক্‌রা, ট্যাক্সি, রিক্সা, ব্রুহাম, ল্যাণ্ডো সর্ব্বপ্রকার বাহনে ভক্তেরা আসিতে লাগিলেন। "হেঁগ্ গো মা, একটা আধলা, লক্ষ্মী মা!" "লেংড়া কাণা কো—" "আরে এদিকে এদিকে! আমার দোকানে বসবেন, আসুন!" "মালা চাই? পাঁঠা? কটা?" "কি মুখুয্যে, আমার সাবেক কালের খদ্দের তুমি টানছ!" "ওরে বাজা, বাজা। আরতির বাজনা বাজা!" পূজা আরম্ভ হইয়াছে।

রামু মালীর ছেলের জ্বরবিকার,সে মায়ের বাড়ীতে পূজা দিতে আসিয়াছে। স্নান করিয়াছে এক ঘণ্টা, পূজা দিবার অবকাশ পায় নাই। পূজাটা নির্ব্বিঘ্নে দিতে পারিলে, পুত্র নীরোগ হইয়া উঠিবে এই আশায় দাঁড়াইয়াছিল।

"পথ ছাড়! পথ ছাড়!!" রামু সরিয়া পথ দিল। বিলাস হালদার আসিলেন, আজ তাঁহার পালা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বাহুতে সোনার বিছা—তাহাতে গণ্ডা দুয়েক নানা আকারের কবচ। ললাটে রক্ত চন্দনের রেখা। রামু সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিল,"ঠাকুর আমার পূজোটা ?" "দাঁড়িয়ে থাক্, ক'টাকার পূজো ?" "পাঁচ সিকের।" "দাঁড়িয়ে থাক্।"

(৩)

মন্দির। তাহার মধ্যে কালীমূর্ত্তি। দুই দিকে চর্ব্বির ঘৃত-প্রদীপ। জবাফুল আর বিল্বপত্রে মাতার আকণ্ঠ আবৃত। মূর্ত্তির মাথার উপরে বিজলী-বাতি, সম্মুখে প্রকাণ্ড পিতলের থালায় পয়সা আর সিকি পুঞ্জীকৃত।

সোরগোল। "কোথা যাচ্ছেন ? দ্বার-প্রণামী দিয়ে যান।" "বাবা নকুলনাথের নামে এক পয়সা।" "পঞ্চায়েতের পয়সাটা দিলেন না ?" নিন চরণামৃত, দিন পয়সাটা।" "পড় বাছা, সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গলাং দক্ষিণে চার পয়সা, কল্যাণ হোক্!" "নাও বাছা, উঠে পড়, আমার যাত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে, তুমি একাই যে

ঘণ্টাভর মাথা কুটছ।” বৃদ্ধা প্রবাসী সন্তানের কল্যাণ ভিক্ষা করিতেছিল, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। “এস গো এস, চটপট সেরে নাও। পড়, কালী কালী মহাকালীং—আচ্ছা হয়েছে। নাও সিঁদুর আর বেলপাতা, ছেলের মাথায় দিও। আর জোড়া পাঁঠা মানৎ করে’ যাও, ছেলে ভাল হ’য়ে যাবে। আর আমাকে খবর দিও, মানৎ শোধ দেওয়ার দিন আমি নিয়ে আসব।”

বেলা দশটার সঙ্গে সঙ্গে বলির বাজনা বাজিল ; অনেকগুলি মাথা নমস্কারের ভঙ্গীতে নত হইল সেই সঙ্গে দশ বারোটা পশু আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

বলি হইয়া গেল, পূজা দেওয়া হইল না। আশঙ্কায় রামুর বুক কাঁপিয়া উঠিল। আগ্রহে মন্দিরের সিঁড়ির দুই ধাপ উপরে উঠিতেই পূজারী ধমক দিলেন, “আরে সর্ব্বনাশ! নেমে যাও, নেমে যাও। ভোগ রাগ হয়নি। কি সব অনাচার।”

রামু অপ্রতিভ হইয়া নীচে নামিয়া নর্দ্দামার ধারে দাঁড়াইল। নর্দ্দমা দিয়া তখন রক্তগঙ্গা বহিয়া যাইতেছে।

(৪)

“ওরে বাজা, বাজা, ভোগের বাজনা বাজা!”

ঢোল সানাই একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল, ড্যাং নাক্ পোঁ।

“সরে’ যা, সরে’ যা সব, ভোগ আসছে!”

রামু নর্দ্দামার প্রান্ত ছাড়িয়া একেবারে চত্বরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভোঁ ঘরর্! সবুজ রঙের প্রকাণ্ড হাওয়া গাড়ী।

"কে এলেন বুঝি! সরে' যা সব, দাঁড়া সরে' দাঁড়া! আমার জপের মালাটা তুলে রাখ ঠাকুর!" বিলাস হালদার চত্বরে নামিলেন।

নামিল অনবগুণ্ঠিতা ভূষণমণ্ডিতা নারীমূর্ত্তি। দীর্ঘ রজনী জাগরণে আরক্তনেত্র, পরিধানে শুভ্র গরদ, হাতে বেলফুলের মালা।

"কুসুম বাইজি! কুসুম বাইজী এসেছেন। ভোগের থালা সরিয়ে পথ করে দাও ঠাকুর! আসুন! আসুন!!" বিলাস হালদার গাড়ীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাতে ডালার দোকানীরা।

"মায়ের পাঁঠা হবে তো? কটা?"

"শ্রাদ্ধ করাবেন না চণ্ডীপাঠ?"

"আজ দিন ভাল আছে মা, একটা স্বস্ত্যয়নের যোগাড় করে' দিই?"

"গঙ্গা নাইবেন তো? না স্নান করে' এসেছেন? তিলক হয়নি যে! ওরে চন্দন, রক্ত চন্দন আর ছাপগুলো আন্, দরজার কাছ থেকে সবাইকে সরিয়ে দাও ঠাকুর। কার্পেটের আসন বিছিয়ে দাও।"

সম্মুখে বিলাস হালদার, দুই পার্শ্বে পূজারী, পশ্চাতে চারিখানি থালায় পূজার উপকরণ বহিয়া চারিজন ব্রাহ্মণ। সুন্দরী মন্দিরে উঠিলেন।

বেলা বারোটা। পশুর রক্তের ধারা শুকাইয়া কালো হইয়া গেছে। পুত্রের পথ্যের সময় উপস্থিত। রামু চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কুসুম বাইজী জপ করিতেছেন। জপ শেষের প্রতীক্ষায় বিলাস হালদার বারান্দায় দাঁড়াইয়া। চত্বরে মালী বাদ্দী পাঁঠা-ওয়ালা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

মায়ের ভোগের অন্নব্যঞ্জনের উপর মাছি উড়িতেছে। কুসুম বাইজীর মানসিক কি আছে জানা যায় নাই, কাজেই ভোগ দেওয়া অসম্ভব।

গুড়ুম! একটার তোপ।

আর অপেক্ষা করা চলে না। দু'দিনের সঞ্চিত উপার্জ্জনের বিনিময়ে সংগৃহীত পূজার উপচার একটী খঞ্জ ভিখারীর হাতে তুলিয়া দিয়া নর্দ্দামা হইতে একটি রক্তচর্চ্চিত বিল্বদল তুলিয়া মাথায় ঠেকাইয়া রামু চলিয়া গেল। যাইবার সময় বার-বার মন্দিরের দিকে চাহিয়া রামু মালী যুক্তকরে প্রণাম করিতে করিতে মায়ের কাছে কি নিবেদন জানাইয়া গেল তাহা সেই জানে।

লাটের স্পেশাল

মাঘের দ্বিপ্রহর। আঙ্গিনায় রৌদ্রের দিকে পিঠ করিয়া বেণু সর্দ্দার সম্মুখে একখানি পাথরের থালায় এক রাশি সরুচাকলি লইয়া মাধ্যাহ্নিক জলযোগের উপক্রম করিতেছিল। রঙ্গীন ভিজা গামছাখানিতে মাথায় আধ-ঘোমটা টানিয়া স্ত্রী বিরাজ পিঠার কাঠা-হাতে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময় আহ্বান আসিল, "সর্দ্দারের পো! বাইরে এসতো একবার।"

দফাদারের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বেণু উঠিয়া পড়িতেছিল, বিরাজ তাড়াতাড়ি কহিল, "মুখের 'গাস্'টা খেয়ে যাও গো।"

"দু'খানা খেয়ে আমার পেট ভরবে নারে, বিরাজ! তুই এখানে দাড়িয়ে থাক্, আমি এক্ষুনি আসছি!"

বেণু হাত ধুইয়া উঠিয়া গেল।

মিনিট দশ পর ফিরিয়া আসিয়া হতাশস্বরে বেণু কহিল, "আমার আর তোর হাতের সরুচাকলি খাওয়া অদেষ্টে নেইরে, বিরাজ! দে দিকিন্ পাগড়ীটা এখুনি, আবার বেরোতে হ'বে।"

"এই ভর দুপুরে আবার কোন্ পোড়ার মুখোর মুখ পুড়েছে যে, তোমায় যেতে হ'বে?" বিরাজ কহিল।

"চেঁচাস্নিরে পাগলী। লাটের গাড়ী আসছে, পাহারায় যেতে

হবে। দে পাগড়ীটা। দাঁড়াওগো দফাদার দা, পাগড়ীটা বেঁধে যাচ্ছি।” দ্বারের দিকে চাহিয়া বেণু কহিল।

বাহির হইতে জবাব আসিল, “একটু চট্‌পট্‌ সেরে নাও, সর্দ্দারের পো। যেতে হ'বে আবার পাকা ছ' কোশ।”

পাগড়ী বাঁধা শেষ হইলে বিরাজ দু'খানা সরুচাকলি হাতে করিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মিনতি করিয়া কহিল, “আমার মাথা খাও, এই দু'খানি গালে দিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে যাও। সেদিনও গড়েছিনু, খেলে না, কোথায় মড়া আগলাতে গেলে! আজ—”

“এখন খেলে আর হাঁটতে পারবনারে বিরাজ। সাঁঝে গাড়ী পার ক'রে দিয়ে পহর রাতেই ফিরে আসব! তুই উনুনে একটু জল বসিয়ে রাখিস। পিঠেগুলো ভালো ক'রে ঢেকে রাখ্‌গে!”—বলিয়া পিষ্টক-স্তূপের দিকে একটি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লাঠি হাতে বেণু চৌকীদার বাহির হইয়া গেল।

স্বামীর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর এই খাদ্যটি অনেক দিন চেষ্টা করিয়াও সে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে পারিল না! পিঠাগুলি গুছাইয়া তুলিয়া বিরাজ গামছায় চোখ মুছিল।

ঘরের বিঘ্নটিকে তো বেণু কোনমতে কাটাইয়া আসিল কিন্তু পথে আর এক বিঘ্ন উপস্থিত। একটি স্বল্পজল অন্ধকার ডোবার ধারে বেণুর সাত বছরের পুত্র মনাই বঁড়শী নাচাইয়া ‘চ্যাং’ মাছ ধরিতেছিল। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে এইটি ছিল তাহার নিত্যকর্ম্ম।

বেণু তাহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য অতি লঘুপদে আসিতেছিল কিন্তু মনাইকে ফাঁকি দিতে পারিল না। পিতার পরিচিত নীল পাগড়ী সে দূর হইতে দেখিয়াছিল কিন্তু পিতা অন্য পথে চলিয়া যাইবে ভয়ে, ভাবে ভঙ্গীতে কোনোরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই। বেণু সতর্ক পদে নিকটে আসিতেই, সে ছিপ ফেলিয়া এক লম্ফে পথের মাঝখানে উঠিয়া আসিল এবং তাহার পোষাকের প্রান্ত মুঠা করিয়া কহিল, "কোথা যাচ্ছ বাবা?" বেণু বিপদে পড়িল! সত্য কথা বলিলে মনাই সঙ্গে যাইবার জিদ্ ধরিবে। একটু ভাবিয়া কহিল, "কালীতলায়।"

জগতে মনাইয়ের ভীতির একমাত্র স্থান ছিল এই বারোয়ারী কালীতলা। সেখানে যত ভূত আর প্রেতের আড্ডা, কোন সূত্রে এই তত্ত্বটী তার শিশু-মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া বাসা বাঁধিয়াছিল। কালীতলার নাম শুনিয়া সে এক পা পিছাইয়া গিয়া কহিল, "সাঁঝের আগে ফিরবে বাবা, জানলে?"

পুত্রের শঙ্কাবিহ্বল দৃষ্টি দেখিয়া বেণু কহিল, "সাঁঝের আগেই ফিরব মনাই, তুই ঘরে যা।" তাহার পর পুত্রকে একটি চুমা দিবার অভিপ্রায়ে দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকে তুলিতে যাইতেছিল, এমন সময় পিছনে দফাদার কহিয়া উঠিল, "পথে দাঁড়িয়ে আর দেরী কোরো না, সর্দ্দারের পো, বেলা ভাটিয়ে আসছে।"

অগত্যা মাথা নীচু করিয়া পুত্রের গালে তাড়াতাড়ি একটা চুমা

দিয়া বেণু কহিল, "ঘরে যা মনাই, তোর মা পিঠে নিয়ে ব'সে আছে।" পিঠার কথা শুনিয়া সে ছিপগাছি তুলিয়া লইয়া বিনা-বাক্যে বাড়ীর পথ ধরিল এবং কিছুদূর গিয়া গলির মোড়ের বেত ঝোপের আড়াল হইতে মুখ বাহির করিয়া পিতাকে অবশ্য অবশ্য সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিবার জন্য দ্বিতীয় বার উপদেশ দিয়া গেল।

(২)

শীতের ছোট শেষ বেলাটি অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রতি চল্লিশ হাত অন্তর চৌকীদার নামধারী এক-একটি মানব-সন্তান লাঠি ঘাড়ে করিয়া লাটের স্পেশালের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া খোলামাঠের তীব্র হাওয়ায় শীতে কাঁপিতেছিল। গাড়ী আসিবার সময় সন্ধ্যায়, কিন্তু রাত্রি প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল গাড়ী তখনও আসিল না। বেণু অধীর হইয়া উঠিল। দিব্য চক্ষে সে দেখিতে পাইল, পাথরের থালায় সরুচাকলি সাজাইয়া এতক্ষণে বিরাজ প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। বেণু জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ীর খবর কি দফাদার দা ?"

দফাদার নিজেও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, "মালিক হুজুরদের হুকুম তামিল করতে এসেছি। থানা থেকে ব'লে দিলে সাঁঝ বেলায় যাবে গাড়ী, এখন তো রাত এক পহর। কাঁথাখানাও আনিনি!" দফাদার মাথার পাগড়ী খুলিয়া গায়ে জড়াইল। শীত তখন ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছিল।

বস্তুতঃ গাড়ী ছাড়িবার সময় ঘণ্টা পাঁচেক পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু গণ্ডগ্রামের চৌকীদারের কাছে সে সংবাদ পৌছে নাই।

এমন সময় মেঘ করিয়া আসিল। চৌকীদারের দল প্রমাদ গণিল। ইহার পর যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তাহা হইলে প্রাণ লইয়া গৃহে ফেরা অসম্ভব, এ কথা দফাদারকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইতে কেহই দ্বিধা করিল না। দফাদার একটি ছোট পুঁটলী উঁচু করিয়া ধরিয়া কহিল, "শীতের ওষুধ সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আয় দেখি!" ইঙ্গিতটা সকলেই বুঝিল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে "বোম্ বোম্ ভোলানাথ" শব্দে স্থানটি মুখর হইয়া উঠিল এবং গঞ্জিকার ধূমে অন্ধকার আরও জমাট বাঁধিয়া গেল। দফাদর ডাকিল, "সর্দ্দারের পো, কোথায় গা?"

বেণু জবাব দিল, "উঁহু! আমি খাব না দফাদার দা।" এক কালে সে পূরাদস্তুর গঞ্জিকাসেবী ছিল কিন্তু বৎসর তিনেক হইল বিরাজ তাহাকে তাহার শাঁখা সিঁদুরের দিব্য দিয়া নেশা ছাড়াইয়াছে; সেই অবধি বেণু গাঁজার কলিকা স্পর্শ করে নাই। শীতের ওষুধ সেবন করিয়া চৌকীদারের দল কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইল। কেবলমাত্র বেণু দুই হাঁটু মুড়িয়া তাহার উপর মুখ রাখিয়া শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

হুস্! হুস্!

"উঠে দাঁড়া সব। লাঠি ঘাড়ে ঠিক হ'য়ে সামনে চেয়ে থাক্!"

দফাদার হাঁকিল।

হুস্! হুস্! গাড়ী চলিয়া গেল—মাল গাড়ী।

বিরক্ত হইয়া চৌকীদারেরা অদৃষ্টকে অভিসম্পাত দিল। দফাদার কহিল, "শীতের ওষুধ আর একবার তৈরী করে' নাও দেখি, শীত ভয়ে ভাগবে।"

ঔষধ সেবন চলিতে থাকিল, দূর হইতে বেণু ধূম-কুণ্ডলীর দিকে চাহিয়া রহিল, নড়িল না।

রাত্রি দশটায় দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িল। বেণু কোনক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল যে, সঙ্গীরা চার পাঁচজন করিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ভূমি-শয্যায় আশ্রয় লইয়াছে।

বেণুর মনে হিংসা হইল। সর্ব্বাঙ্গ তখন অসহ্য শীতে আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল ; পদতলের পাথরের নুড়িগুলি মনে হইতেছিল বরফের টুক্‌রার মত। কিছু দূরে তারের বেড়ায় হেলান দিয়া দফাদার ঘুমাইতেছিল। বেণু কিছুক্ষণ কি ভাবিল তাহার পর দফাদারের গাঁজার সরঞ্জামের পুঁটলীটি বাহির করিয়া আনিল। কলিকায় আগুন দিয়া সে মৃদুস্বরে কহিল, "কিছু মনে করিসনি, বিরাজ! তোর শাঁখা-সিঁদুর অক্ষয় হোক! আজ এক টান না টানলে আর বাঁচব না। বোম্! বোম্!"

অনেক দিনের অনভ্যাস, কলিকায় বার দুই দম দিতেই বেণুর মাথা ঘুরিয়া উঠিল, লাইনের দিকে ঠিক্‌রিয়া পড়িয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মাথায় একটু জল দাও গো দফাদার দা! সারা

পিরথিম ঘুরছে!" তাহার আড়ষ্টকণ্ঠ হইতে কথাগুলি বাহির হইল অতি ক্ষীণস্বরে, তাহাতে দফাদারের নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

মধ্য রাত্রি। হিমসিক্ত আচ্ছাদনের নীচে কুণ্ডলী করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরীর দল কাঁপিতেছিল। এমন সময়ে দূরের কোনো সজাগ প্রাণীর কণ্ঠ শোনা গেল, "লাটের গাড়ী! লাটের গাড়ী!"

প্রদীপ্ত আলোক-ফলকে নিশীথের অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া রক্তচক্ষু লৌহ-দানব ছুটিয়া আসিল। চৌকীদারের দল কাঁপিতে কাঁপিতে ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কেবল উঠিল না একজন! যেখানে বেণু সর্দ্দার পাহারায় ছিল সেখান হইতে অতি ক্ষীণ একটি আর্ত্তনাদ শোনা গেল—মুহূর্ত্তের জন্য। এঞ্জিন কোনও অজ্ঞাত বস্তুতে বাধা পাইয়া একটু দুলিল কিন্তু তাহার গতি মন্থর হইল না।

স্পেশাল চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইল যে লাটের গাড়ী নিরাপদে সহরে পৌছিয়াছে।

* * * *

বেণু সর্দ্দারের নিষ্প্রাণ দেহপিণ্ড যখন সহরের 'মর্গ' হইতে শতদীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিল তাহার পূর্ব্বেই বিরাজের সরুচাকৃলি শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে।

চণ্ডীমণ্ডপ

প্রকাণ্ড একটি বেলগাছ। তাহার ছায়ায় মোহন ঠাকুরের চণ্ডীমণ্ডপ। সম্মুখে আঙ্গিনা, প্রথম রাত্রির পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় ধব্ ধব্ করিতেছে।

কোজাগরের পরের দিনের রাত্রি। চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন মোহনপুরের সমাজপতিদের বার্ষিক বৈঠক। সামাজিক দুষ্কৃতিকারীদের বিচার ও দণ্ডদানের সভা।

দেবীর আসনের চৌকীতে তখনও সিন্দূর জ্বল জ্বল করিতেছে। সেই আসনকে কেন্দ্র করিয়া কুশাসন এবং পাটি বিছাইয়া সমাজ-পতিরা বসিয়াছেন। প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড নিমের গুঁড়ি জ্বলন্ত, তাহার পাশে চিমটা হাতে দীর্ঘদেহ বংশী গোপ তামাক জোগাইতেছে। চণ্ডীমণ্ডপে ডাবা থেলো ও বাঁধা হুঁকা অস্থাবর সম্পত্তির মত হস্ত হইতে হস্তান্তরে ঘুরিতেছে, পণ্ডিত মহাশয় মহিষ-শৃঙ্গের কৌটা খুলিয়া ঘন ঘন নস্য লইতেছেন। কাশি এবং হাঁচির শব্দে চণ্ডীমণ্ডপ মুখর।

"না হে চক্কোত্তি, আর সওয়া যায় না। দিন-কাল ক্রমেই খারাপ হ'য়ে আসছে। তোমরা গাঁয়ে থাক, রাঘবও রয়েছে—তোমাদের দেখা-শোনা উচিত, এখন হাল ছেড়ে দিলে শেষে সামলাতে পারবে না।"

"দেওয়ানজী যা বললেন ঠিক! কিন্তু রাঘব করবে কি?

মোহন ঠাকুরের ছেলে হ'লেই ত হয় না, বয়সটা কি তার? আপনি থাকুন একটা মাস, দেখুন কি করি!"

সাহেবপুরের রেশমকুঠির দেওয়ান হরি মুখুয্যে ব্রেজাইয়ের বোতাম খুলিয়া স্ফীতোদর বাহির করিয়া কহিলেন, "বুঝি তো সব দাদা, কিন্তু চাকর আর কুকুর। এই পনেরটা দিন ছাড়া সাহেব ছুটি মঞ্জুর করে না তার কি? গাঁয়ে থাকতে গেলে চাকুরী ছাড়তে হয়, একবার ভাবি—"

ন্যায়রত্ন মহাশয় কহিলেন, "সর্ব্বনাশ! তুমি আছ তবু মোহন-পুরের গাজনতলায় ঢাক বাজে হে, মুখুয্যে। চাকুরী তো তোমার একার নয়, দশ জনের। দশ জন খাচ্ছে। পাল-পার্ব্বণে অতিথ বোষ্টম সেবা হচ্ছে। গোয়াল মালীরা টিঁকে আছে। দীর্ঘজীবী হ'য়ে থাক, বাবা!"

হরি মুখুয্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পায়ের ধূলা লইয়া কহিলেন, "এটা কি একটা কথা, পণ্ডিত মশায়? আপনাদের আশীর্ব্বাদই সব, দশ জনের বরাতেই হচ্ছে, আমি তো নিমিত্ত।"

দেওয়ানজী ব্রেজাইয়ের বোতাম আঁটিয়া দিলেন।

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আঙ্গিনায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দাঁড়াইল এক বৃদ্ধ।

"কে, সাধুচরণ?"

নিজের অপরাধের গুরুত্ব সে জানিত। কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "আজ্ঞে, বাবাঠাকুর!"

"ওরে বেটা হারামজাদা!"—শশাঙ্ক ঘোষাল হাঁকিলেন।

"খড়ম পেটা ক'রে তাড়াও ব্যাটাকে গাঁ থেকে! ধর্ম্ম নষ্ট করলি"—ন্যায়রত্ন মহাশয় নস্য লইলেন। সাধুচরণ কাঁপিতে লাগিল।

দেওয়ানজী ডাকিলেন, "রাঘব কোথায় হে? কি করা যাবে এর, এস দেখি শুনি।"

স্বর্গীয় মোহন ঠাকুরের সন্তান রাঘব ঠাকুর। বছর ত্রিশেক বয়স। মাথায় বাবরী, বলিষ্ঠ সুপুষ্ট দেহ। কপালে সিন্দূরের ত্রিপুণ্ড্র, হাতে মোটা বাঁশের লাঠি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বয়সে সকলের ছোট বলিয়া সকলের পশ্চাতে এক কোণে বসিয়া কলিকায় তামাক খাইতেছিলেন। সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "বিচার আপনারা করুন, খুড়োমশাই। আপনাদের যা মত হবে আমারও—"

"তা কি হয়?" দেওয়ানজী কহিলেন, "মোহন ঠাকুরের ছেলে তুমি বাবাজী! বয়সে যাই হও মোহনপুরে তোমার কথাই আগে।"

রাঘব ঠাকুরের গম্ভীর তীব্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "সাধুচরণ!"

রাঘব ঠাকুরের দিকে ভয়ে সাধুচরণ চাহিতে পারিল না, চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠায় মাথা রাখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কহিয়া উঠিল, "আর করব না, বাবাঠাকুর! এবারকার মত—"

"বেটা হারামজাদা! এবারকার মত! মোহনপুরের জেলে

তুই বেটা, তোর পাল্কীতে মুর্গী রেঁধে খেল সাহেব! মোহনপুরের মুখে কালী দিলি বুড়োকালে, হারামজাদা!”

সাধুচরণ রাঘব ঠাকুরের সম্মুখে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল মাত্র।

ন্যায়রত্ন মহাশয় নস্যদানি রাখিয়া খড়ম তুলিয়া লইলেন। সাধুচরণ আর্তনাদ করিয়া উঠিল, “প্রাচিত্তির করব, বাবাঠাকুর!”

“প্রাচিত্তির। পয়সা পাবি কোথা রে? কে কে ছিলি সে পাল্কীতে?”

কাঁপিতে কাঁপিতে আরও পাঁচজন নত মস্তকে কম্পমান দেহে সাধুচরণের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

জগু, মান্‌কে, বৈকুণ্ঠ, বিপিন আর শ্যামাদাস!

“মুর্গী আর পেঁয়াজের গন্ধ বড় ভালো রে হতভাগারা! আবার তুলসীর মালা রেখেছিস!”

জগু, মাণিক, বিপিন প্রভৃতি সমস্বরে কহিল, “আর হবে না, বাবাঠাকুর!”

“আর যদি কখনও হয় তো, দেখছিস লাঠি, পাঁজর ভেঙ্গে দেব। গত বচ্ছর সনাতনের কথা মনে আছে তো? যা সব! এবার কালীপূজোর দিন পাঁচ মণ মাছ জোগাতে হবে তোদের ছ'জনকে, দাম পাবিনি।”

ছয়টি প্রাণী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল।

“তোদের পাড়াশুদ্ধ ছেলে-মেয়েকে এখানে পাঠাবি সেদিন

দু'বেলা প্রসাদ পাবে। যা বেটারা! আজ রাত ভোর কীর্ত্তন ক'রে কাল সকালে স্নান ক'রে আসবি, একটু শাস্তি দিয়ে দেব।" রাঘব ঠাকুর লাঠি কোলের উপর রাখিয়া আসন লইলেন।

বৃন্দাবন বিশ্বাস আসিয়া দাঁড়াইল। অপরাধ গুরুতর। কায়স্থ পরিচয়ে পানীয় জল দিয়া সে এক সদ্‌ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে, অভিযোগ এইরূপ। "পের্‌নাম হই—" বৃন্দাবন যুক্তকরে প্রণাম করিল।

"কি রে বেন্দা? বামুন-কায়েতকে জল খাওয়াতে সাধ হয় কন্ঠী নিলেই পারিস। এসব দুর্ম্মতি কেন রে বেল্লিক!" রাঘব ঠাকুরের কথা শুনিয়া নতশিরে বৃন্দাবন দাঁড়াইয়া রহিল জবাব দিল না।

"বেটা! অধার্ম্মিক চণ্ডাল!" ন্যায়রত্ন মহাশয় চীৎকার করিয়া খড়ম ছুঁড়িলেন। বাঁ হাতে ললাটের রক্তধারা চাপিয়া বৃন্দাবন বসিয়া পড়িল। পর মুহূর্ত্তেই উঠিয়া খড়মখানিতে মাথা ঠেকাইয়া সসম্ভ্রমে সেখানিকে চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে তুলিয়া দিল।

"আর কে আছিস?" রাঘব ঠাকুর হাঁকিলেন। প্রাঙ্গণের অন্ধকার কোণ হইতে জন কয়েক লোক উঠিয়া আসিল। তাহাদের অঙ্গ কম্পমান মুখ পাংশু।

"বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুর!!" উন্মাদের মত একটি স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল।

"বাবাঠাকুর!"

"আরে ছুঁস্‌নি ছুঁস্‌নি বাগ্‌দী-বৌ! হোথা থেকেই বল্‌।"

বাগ্দী-বৌ ছাড়িল না, রাঘব ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিল। সমস্ত অঙ্গ অশুচি হইয়া গেল, রাঘব ঠাকুর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "দিলি ছুঁয়ে সন্ধ্যাবেলায়!"

বাগ্দী-বৌ তথাপি পা ছাড়িল না—"বাঁচান, বাবাঠাকুর!"

"আরে উৎপাত, হ'ল কি বল্ দেখি তোর?"

"মান-সরম্ভম সব গেল বাবাঠাকুর! শেষ বেলায় ঘাটে গিয়েছিল নারাণী। নেয়ে আসবার পথে ও-গাঁয়ের রহিম সর্দ্দারের বেটা বলে কি না—মেয়ে তো আমার কলসী ফেলে পালিয়ে এসেছে। লজ্জায় মাথা কাটা গেল, বাবাঠাকুর!"

চণ্ডীমণ্ডপ শুদ্ধ সমাজপতিরা হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আঙ্গিনায় বংশী গোপের হাতে চিম্‌টা ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। বৃদ্ধ সাধু মাঝির ন্যুব্জ দেহ সহসা ঋজু হইয়া গেল। ক্ষতস্থানে খানিকটা ছাই লেপিয়া বৃন্দাবন উঠিয়া দাঁড়াইল। বাম হস্তের বংশ-যষ্টি দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া রক্তচক্ষু রাঘব ঠাকুর তিন লম্ফে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গেলেন, অপরাধীর দল বিনাবাক্যে তাঁহার অনুসরণ করিল, চণ্ডীপের অঙ্গন শূন্য হইয়া গেল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্যামা বাগ্দীনীর হাত ধরিয়া তুলিয়া কহিলেন—

"ভয় করিস্‌নে বাগ্দী-বৌ! আমরা আছি। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা দেখে নেব। আজ রাতে দেওয়ানজীর বাড়ীতে নারাণীকে নিয়ে এসে শুয়ে থাকবি। রামু; জগাই বৈকুণ্ঠ যা

বাগ্দী-বৌয়ের সঙ্গে—মা-বেটিকে সাথে ক'রে দেওয়ান-বাড়ীতে পৌঁছে দে।"

*　　*　　*　　*

ইহার পর চল্লিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মোহন ঠাকুরের চণ্ডীমণ্ডপ দেনার দায়ে কয়েক হাত ঘুরিয়া শেষে 'দি মোহনপুর ড্রামাটিক ক্লাবে' পরিণত হইয়াছে।

কোজাগরের পরের দিন সন্ধ্যা। আগামী দীপান্বিতার দিন বারোয়ারী কালীতলায় মেবার-পতনের অভিনয় হইবে, তাহারই মহলা চলিতেছিল।

ক্লাব-ঘরে জন বিশেক লোক বালক এবং যুবক। কয়েক জোড়া তবলা, ডুগি, গুটি দুই হার্ম্মোনিয়াম, একখানা বেহালা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; বেড়ার গায়ে খানকয়েক স্বদেশী ও বিদেশী অভিনেতার বিচিত্র মুখভঙ্গীর ছবি, গুটিকয়েক বাবরী চুল, জমিদার চাপকান ও একখানি বড় আয়না।

হার্ম্মোনিয়ামে সুর দিয়া চপল কহিল,"আচ্ছা 'সি-সার্পে' ধ'রে দাওতো দেখি।" জনকয়েক বালক মুখের জলন্ত বিড়ি মাটিতে নামাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়, যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর।'

"ও কি হচ্ছে অনঙ্গ! চিতোর বলছ অমন ক'রে যে। তোমার 'ফিলিং' হচ্ছে না মোটে। চোখটা একটু বোঁজ—মিঠে রকমের। ঘাড়টা একটু কাৎ কর, বাঁ পা'টা একটু সামনে। ব্যস্ অনেকটা

হ'য়েছে ! মনে ভাবতে থাক তুমি সত্যিকার অমরসিংহ, তা হ'লে ঠিক 'পস্চার' আসবে। ওরে একটা সিগারেট দে।"

"মাষ্টার মশাইকে একটা সিগারেট দিয়ে যা কমল। আচ্ছা নাচগুলোতে আমাদের খুব সাক্‌সেস হবে, না ? কি বলেন,মাষ্টার মশাই ?" অনন্ত উত্তরের প্রতীক্ষায় ব্যাকুলভাবে মাষ্টারের দিকে চাহিল।

মাষ্টার আশ্বাস দিয়া একবার গা মোড়া দিতে দিতে বলিলেন, "খুব সম্ভব। আমরা কলকাতায় ছোক্‌রা খুঁজতে খুঁজতে হায়রান, আর তোমাদের জেলে ছুতোর পাড়া থেকেই তিনটে প্লের নাচের ছেলে জুটে যায়, তাও বিনি পয়সায় ! কি ? ডাব ? না, খাব না, গলা ধ'রে যাবে, তার চেয়ে চা আনো।"

"ওরে চায়ের জল চাপিয়ে দে।" তিন চারজন সমস্বরে আদেশ দিল।

একটি যুবক হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া উপস্থিত।

অনঙ্গ কহিল, "কি প্রেম-কোরক, হাঁফাতে হাঁফাতে আসছিস যে ?"

"আর শুনো না, অনঙ্গ-দা ! বুড়োরা সব বৈঠক বসিয়েছে, বলছে জাত গেল, ধর্ম্ম গেল ! যত জেলে মালী ছোট জাতের ছেলে নিয়ে নাকি আমাদের কারবার, তাদের হাতের জল খেয়ে চা খেয়ে উচ্ছন্ন যাচ্ছি ! হাঃ ! হাঃ !"

প্রেম-কোরক হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িল।

"ফুল্‌স্‌! ছোট জাত! আর ওরা সব বড় জাত! ওরাই তো সর্ব্বনাশ করলেন জাতটার! ও সব গোঁড়ামি—"

অনঙ্গ রুখিয়া উঠিল।

চপল হার্ম্মোনিয়ামে সুর দিয়া কহিল, "ছোট জাতই আমরা চাই, তারা থাকলেই জাত থাকবে।"

"ধা ধিঙ্গাড় ধা, ধিঙ্গাড় ধা ধা" বোল আওড়াইয়া সুধাংশু তবলায় চাঁটি দিয়া কহিল,"একবার তেরে কেটে তাক্‌ ক'রে দিতে পার না অনঙ্গ-দা?"

"আর দু'টি বচ্ছর সবুর কর সুধাংশু, মোহনপুরের চেহারা একদম বদলে দেব, দেখে নিও।" অনঙ্গ সিগারেট ধরাইল।

অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল বিপিন মালী। তাহার দৃষ্টি শঙ্কিত।

"কি রে, বিপিন, অত শুকনো যে?"

"আজ্ঞে বাবু কি বলব, আপনাদের চরণে আছি।"

"ব্যাপার কি বলতো দেখি। আবার বুঝি সমাজে 'ঠেকা' করেছে, না?"

"না, বাবু। বাড়ীর মেয়েদের তো ঘাটে যাওয়া বন্ধ হ'ল, বাবু। কাল আমার বোনকে ঘাটের পথে ইসারায় ও পাড়ার কবির সেথ ডাকছিল, আজ আমার মেয়ের হাত ধ'রে টেনেছে। আর ভয় দেখিয়েছে যদি বোনকে তাদের বাড়ী না পাঠাই তবে বাড়ীতে চড়াও করবে।"

"তুই কি করেছিস?"

"গরীব মানুষ, আমি কি করব, বাবু? আপনারা একটা বিহিত করুন।"

"চৌকীদারকে বলিস নি?

"বলেছিনু। সে 'গা' করলে না। থানায় যেতে বলে। সে তো আবার দশ কোশ পথ, ঘর ফেলে যাই কি ক'রে? আপনারা আছেন বাপের মত—" হাউ হাউ করিয়া বিপিন মালী কাঁদিয়া উঠিল।

"এই তোমাদের গাঁয়ের একটা মস্ত 'ড্রব্যাক'—কাছে থানা নেই।"—বলিয়া মাষ্টার মহাশয় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

"সেটা ঠিক! যে রকম অবস্থা, থানা কাছে না থাকলে চলবার আর উপায় নেই। কাগজে এসব নিয়ে লেখালেখি করবারও দরকার হ'য়ে পড়েছে দেখছি। শেষে কোন্‌দিন গুণ্ডাগুলো আমাদেরই মাথা ফাটিয়ে দিয়ে যাবে। আচ্ছা তুমি যাও বিপিন, বাড়ীতেই থেকো, কোথাও যেয়ো না। মেয়েদের আর ঘাটে জল আনতে পাঠিও না। কাল সকালে একবার এসো। ভেবে-চিন্তে যা হয় করা যা'বে। হঠাৎ তো কিছু করা যায় না।"

বিপিন চলিয়া গেল। আধ ঘণ্টা পরে সমবেত কণ্ঠস্বরে সমস্ত পল্লী মুখর হইয়া উঠিল—

"জ্বলিল যেখানে সেই দাবাগ্নি
—সে রূপ-বহ্নি পদ্মিনীর।
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা-আহবে
যবন-সৈন্য ক্ষত্রবীর।"

প্রত্যর্পণ

যে তাহার নাম চাঁপা রাখিয়াছিল, সে মোটেই ভুল করে নাই। ফুলটির বর্ণের সহিত দেহের বর্ণের কোনও পার্থক্য ছিল না; কিন্তু চাঁপার অদৃষ্ট ছিল মন্দ। দশ বছর বয়সে গোপাল বৈরাগীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তেরো বৎসরে সে বিধবা হইল। তখন চাঁপার মা বাঁচিয়াছিল; আর একবার চাঁপাকে পাত্রস্থ করিবার চেষ্টা বুড়ী অনেকবার করিয়াছিল কিন্তু কন্যা রাজী হইল না। তারপর মা মরিয়া গেল। চাঁপাও নিরুদ্বেগে দিন কাটাইয়া সবে বিশ বৎসরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

একেবারেই নিরুদ্বেগে দিন কাটাইয়াছে বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। তাহার রূপের পূজারীর অভাব ছিল না; নবীন গোয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া ছিদাম বৈষ্ণব পর্য্যন্ত সকলেই এক আধবার তাহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া ধমক খাইয়া গেছে। আজকাল আর বড় কেহ চাঁপার কাছে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিত না। একে চাঁপার ধর্ম্মবাপ গ্রামের জমিদার রাজীববাবুর শাসন, তাহার উপর চাঁপার তিরস্কার, এই দুইটি পদার্থ পাণিপ্রার্থীদের আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেছিল।

চাঁপা লেখাপড়া কিছু জানিত। গ্রামের প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়ে লব্ধ বিদ্যাকে সে ক্রমাগত রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া

অনেকদূর অগ্রসর করিয়া লইয়াছিল। সকালে মুড়ি ভাজিয়া বৈকালে রূপগাঁর বাজারে সে মুড়ি বেচিত। রাত্রে ফিরিয়া তাহার সঙ্গিনী জমিদার বাড়ীর ঝি লক্ষ্মীবুড়ীকে শ্রোত্রীর আসনে বসাইয়া মহাভারত পড়িত, এইরূপে চাঁপার দিন কাটিয়া যাইতেছিল।

সেদিন শ্রাবণের মেঘ অপরাহ্নেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া তুলিয়াছে। চাঁপা তাড়াতাড়ি মুড়ী বেচিয়া বাড়ী ফিরিল। গৃহের বাহিরের আঙ্গিনায় নিম গাছের ঘন ছায়া অন্ধকার রচনা করিয়া রাখিয়াছে। আঙ্গিনায় পা দিয়াই চাঁপা দেখিল কে যেন বারান্দায় শুইয়া। অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখিবার উপায় ছিল না, চাঁপা প্রশ্ন করিল, "কে ও?" কোন উত্তর আসিল না। তখন মুড়ীর ডালাটি রাখিয়া একটি প্রদীপ হাতে করিয়া সে বাহিরে আসিল।

যে শুইয়াছিল তাহাকে চাঁপা কোনও দিন দেখে নাই। কুড়ি বাইশ বছরের যুবক চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিল, চাঁপা তাহার কাছে দাঁড়াইয়া আবার প্রশ্ন করিতেই যুবক চক্ষু মেলিয়া কহিল, "জল"।

চাঁপা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? কি হ'য়েছে?" যুবক শুধু কহিল,"জল! পিপাসা!" চাঁপা বুঝিল আগন্তুক অসুস্থ। ঘটিতে জল আনিয়া তাহাকে জলপান করাইয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল দারুণ জ্বর! জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? এখানে কি ক'রে এলে?"

যুবক যাহা বলিল, তাহার সংক্ষিপ্তসার এই যে, তাহার নাম বনমালী। মহেশতলায় যাইতে জ্বরের বেগ প্রবল হওয়াতে

এইখানে শুইয়া আছে, জ্বর কমিলেই চলিয়া যাইবে। মহেশতলা রূপগাঁ হইতে দুই ক্রোশ। আত্মীয় থাকিলে সেখানে সংবাদ পাঠাইবে ভাবিয়া চাঁপা প্রশ্ন করিল,"সেখানে তোমার কে আছে?" যুবক শুধু কহিল, "কেউ না। মন্দির দেখতে যাচ্ছিলাম।"

চাঁপা একটু বিব্রত হইয়া কহিল, "তাইতো! এখানে তোমাকে কে দেখবে? কোথা থেকে বা এলে!"

যুবক কহিল, "কাউকে দেখতে হবে না। জ্বর কমলেই আমি চ'লে যাব। তুমি যাও।" স্বরে একটু তীব্রতা ছিল, চাঁপা তাহা অনুভব করিল। সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। "মাথার কাছে ঘটিতে জল রৈল, পিপাসা হ'লে খেও"—বলিয়া চাঁপা ভিতরে চলিয়া গেল।

রাত ন'টায় চাঁপা একবার বাহিরে আসিল। বনমালী তখন জ্বরের ঘোরে অস্ফুটস্বরে প্রলাপ বকিতেছিল। চাঁপা প্রমাদ গণিল। বাহিরে এই অবস্থায় একটা মানুষকে কি করিয়া ফেলিয়া রাখা যায়? আর ভিতরেই বা অপরিচিত যুবাকে স্থান দেয় কি করিয়া? মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ সেই সময় লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত দেখিয়া সে কহিল, "তা আর কি করবে?" 'কৃষ্টের জীব' ফেলতে তো পারবে না! বাইরের ঘরে মাচার উপর বিছানা ক'রে দাও। আহা কার বাছা যেন!"

সেইটিই সুযুক্তি বোধ হইল; বিছানা করিয়া দুইজনে ধরাধরি করিয়া আনিয়া বনমালীকে ভিতরে শোয়াইয়া দিল। সারা রাত্রি

ধরিয়া মাথায় জল ঢালিয়া আর পাথার বাতাস করিয়া চাঁপা যখন ঘুমাইয়া পড়িল তখন প্রভাত হইয়া গেছে।

সে দিন আর মুড়ি ভাজা হইল না।

(২)

সে দিনও জ্বর পূর্ব্ববৎই রহিল। চাঁপা প্রথম প্রথম একটু বিরক্তি বোধ করিতেছিল কিন্তু দুপুরে জ্বরের ঘোরে যখন বনমালী তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া কহিল, "তুমি অনেক করেছ আমার জন্যে, কিন্তু আমি বোধ করি বাঁচব না।" তখন অকস্মাৎ চাঁপার চক্ষু দুটি ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজের সমস্ত শ্রম ও অসুবিধার কথা ভুলিয়া গিয়া সে কহিল, "ভয় কি? সেরে উঠবে। তুমি ঘুমোও, আমি বদ্দি ডেকে আনছি।"

বেলা তিনটায় মাখন কবিরাজ আসিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

পাঁচদিন দোকান-পাট ফেলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে চাঁপা বনমালীর সেবা করিল। কবিরাজ যেদিন আসিয়া কহিয়া গেলেন যে, ভয়ের কারণ আর নাই, সেদিন চাঁপা আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল। বনমালী তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "কাঁদছ কেন? আমি সেরে উঠেছি।"

চাঁপা হাত ছাড়াইয়া পথ্য আনিতে চলিয়া গেল।

অন্নপথ্য পাইবার পর বনমালী কহিল, "তুমি যা করেছ আমার জন্যে তার শোধ নেই। যদি ভগবান দিন দেন—"

চাঁপা কহিল, "সে সব আর এখন শুনতে পারিনে, হপ্তা ধ'রে দোকান বন্ধ, এখুনি যাব। তুমি বাইরে বেরিও না, ঘরেই ব'সে থাক। আর এই অষুধটা—" বলিয়া এক মোড়ক গুঁড়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, "এটা দুপুরে তুলসী রস দিয়ে খেও। আমি স্নান সেরে তুলসী তুলে দিয়ে যাব'খন।"

সমস্ত দিন ধরিয়া বনমালী কত কি ভাবিল। এই দরিদ্র নারীর উপার্জ্জন সে কেবল বসিয়া বসিয়া ভোগ করিতেছে। এ অবস্থাটা সুখকর নহে। সন্ধ্যায় চাঁপা ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বর আসে নি?" বনমালী কহিল, "না"। পরক্ষণেই কহিল, "দেখ আমি যেতে চাই!"

চাঁপার মুখখানা সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। অন্ধকারে বনমালী তাহা দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে কহিল, "তা বেশ, যাও না। তা আর আমায় জিজ্ঞেস কেন?" কথাটি ঠিক অনুমতির মত শোনাইল না দেখিয়া বনমালী চুপ করিয়া গেল। এক প্রহর রাত্রে যখন দুধ বার্লি লইয়া চাঁপা উপস্থিত হইল, তখনও তাহার মুখের কালো ছায়াটি কাটিয়া যায় নাই। বনমালী এক চুমুকে পাত্রটি নিঃশেষ করিয়া কহিল, "দেখ তুমি গরীব। আর কতদিন আমাকে পুষবে? সেইজন্য যেতে চাইছি। এখন ভাল হ'য়েছি, বোধ করি যেতে পারব।"

চাঁপা একবার বনমালীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার যে যাওয়াই উচিত তাহাতে চাঁপারও কোনোও সন্দেহ ছিল না কিন্তু

মনের একটি কোণে একান্ত অসহায় অতিথিটির জন্য খানিকটা মমতা সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, ‘চলিয়া যাও’ বলিতে মন সরিতেছিল না। অনেক ভাবিয়া কহিল, “দু’বেলা ভাত খেয়েই চ’লে যেও।”

“আচ্ছা” বলিয়া বনমালী শয্যা লইল।

(৩)

সে দিন বনমালী ধরিয়া বসিল যে বিকালেও তাহাকে ভাত দিতে হইবে। আপত্তি করিলে সে অন্য কিছু ভাবিয়া লইতে পারে ভাবিয়া চাঁপা কহিল, “বেশ!” কিন্তু তাহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল, সমস্ত দিন আর সে ভালো করিয়া বনমালীর সঙ্গে কথা কহিল না। বনমালী তাহা লক্ষ করিল। কয়েকদিন নিয়ত নারীর সংসর্গে থাকিয়া রমণীর চিত্ত-বিশ্লেষণের তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।

অপরাহ্নে উনুন জ্বালিয়া চাঁপা হাঁড়ি চড়াইয়াছে এমন সময় ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া এক বৈষ্ণব আসিয়া আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া অতি করুণকণ্ঠে কহিল, “দুটো চাল দাও মা, বৈষ্ণব, একাদশীর দিন। পারণ কর্ব্ব।” আজ একাদশী শুনিয়াই চাঁপার বুকের ভার যেন অনেকটা লঘু হইয়া গেল, বনমালীর দিকে ফিরিয়া সে কহিল, “আজ যে একাদশী তা তো ভুলেই গেছলাম।”

বনমালী সমস্ত দিন ধরিয়াই চাঁপার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতে-

ছিল। এ কথাটির উদ্দেশ্য কি বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না, কহিল, "তাহ'লে, আজ আর ভাত খাব না। থাক্।"

চাঁপার মুখখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল, কহিল, "রুটি গ'ড়ে দেব, দুধ দিয়ে তাই খেও, কি বল?"

বনমালী নিতান্ত সুবোধ বালকের মত কহিল, "তাই দিও।"

ভিখারী সেদিন চাঁপার বাড়ী হইতে তিন দিনের উপযোগী সিধা লইয়া গেল।

পরদিন বনমালী আর বৈকালে ভাত খাইবার জন্য জিদ্ করিল না, শুধু বাজারে যাইবার সময় এক দিস্তা রঙ্গীন কাগজ আনিতে চাঁপাকে বলিয়া দিল। রাত্রে রঙ্গীন কাগজের দিস্তাটি হাতে করিয়া বনমালীর ঘরে আসিয়া চাঁপা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি ভাত খাব?"

এ প্রশ্নের উত্তর বনমালী অনেকক্ষণই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, কহিল, "না। এ ক'দিন থাক্, একেবারে পূর্ণিমার পরেই খাব।"

চাঁপা খুসী হইয়া গেল।

প্রভাতে উঠিয়া চাঁপা দেখিল যে তাহার ঘরের দাওয়ায় আট দশটি রঙ্গীন কাগজের খাঁচা, তাহার মধ্যে নানা রঙের পাখী। খাঁচা আর পাখীর নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বেলা হইলে বনমালী যখন চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিল তখন চাঁপা কহিল, "কাল সারারাত জেগে বুঝি এই সব করেছ? এরপর যদি অসুখ করে তাহ'লে কে দেখবে বলতো?"

বনমালী সে কথার কোনও জবাব না দিয়া কহিল, "তুমিতো বাজারে যাবে, এগুলো নিয়ে যাবে।"

চাঁপা কহিল, "কি হবে?"

বনমালী কহিল, "বিক্রী! দু'দশ আনা যা হয় তাই লাভ। শুধু ব'সে ব'সে খাচ্ছি।"

চাঁপা বলিল, "তাই ব'লে তুমি রাত জেগে রোগ ক'রে আমাকে ভোগাবে? আর এ সব বইবে কে? আমি একা মানুষ মুড়ি দেখব না পাখী দেখব?"

বনমালী চুপ করিয়া গেল।

বৈকালে চাঁপা দেখিল যে, সুতোর সঙ্গে খাঁচাগুলি ঝুলাইয়া বনমালী বাহির হইয়া যাইতেছে। সকাল বেলার কথাগুলি মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া কহিল, "তোমাকে আর যেতে হবে না। দু'দিন ভাত খেয়েছ আর আজ যাবে এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে বাজারে! এমন মানুষ আমি দেখিনি। দাও দেখি আমার হাতে।" বনমালী বিনা বাক্যে খাঁচার সুতাগাছি চাঁপার হাতে দিয়া কহিল, "বেশ সাবধান ক'রে নিয়ে যেও। জোর হাওয়া লাগলে ছিঁড়ে যাবে।" চাঁপা মুড়ির ডালি মাথায় করিয়া হাতে খাঁচাগুলি ঝুলাইয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যায় ফিরিয়া চাঁপা হাসিতে হাসিতে কহিল, "এই নাওগো তোমার খাঁচার দাম। দু'টাকা ছ'আনা। বনমালী হাত সরাইয়া কহিল, "তুমি রাখ।" চাঁপা কহিল, "তোমার জিনিষ—"

বনমালী তাহাকে বাধা দিয়া একান্ত অসঙ্কোচে চাঁপার আঁচলের খোঁটায় পয়সাগুলি বাঁধিয়া দিয়া কহিল, "তুমি যদি না বাঁচাতে তবে এ খাঁচা কে গড়ত চাঁপা ?"

চাঁপা একবার মাত্র বনমালীর দিকে চাহিয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

পরদিন হইতে বনমালী রীতিমত কাগজের ফুল পাখী পাতা গড়িতে লাগিয়া গেল। চাঁপা অবসর মত তাহার কাজে সাহায্য করিত। এইরূপে দিনকয়েক কাটিয়া গেল। একদিন বনমালী কহিল, "আচ্ছা একটা দোকানঘর ভাড়া করলে হয় না ? মুড়ি মুড়কী থাকবে তার সঙ্গে থাকবে ফুল পাখী খেলনা। দিনের বেলা সেখানে ব'সেই কাজ করব।"

চাঁপা উৎসাহিত হইয়া কহিল, "সে খুব ভালো হবে। তুমি বেচা কেনা জান তো ? অনেকে আবার ঠকিয়ে নেয়।"

বনমালী কহিল, "তুমি শুধু দাম ব'লে দাঁড়ি পাল্লা ঠিক ক'রে দেবে। আর সব আমি নিজে করব।"

ইহার পর দোকানে কি কি রাখিবে সে সম্বন্ধে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আলোচনা হইল। প্রতিবেশিনী মণি বৈষ্ণবীর মত দোকান করিবার ইচ্ছা চাঁপার অনেকদিন হইতেই ছিল কিন্তু একা মানুষের সাধ্য নয় বলিয়া এতদিন অভিপ্রায়টি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বহুদিনকার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা আসন্ন দেখিয়া সে অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া উঠিল, সারারাত এই উৎসাহের উত্তেজনায়

তাহার ঘুম হইল না। তাহার মুড়ি মুড়কির দোকান কয় বৎসরে নবীন সরকারের মত মনোহারী দোকানে রূপান্তরিত হইতে পারে, তাহারও একটা সময় সে স্থির করিয়া রাখিল।

চাঁপার দোকান ঘর ভাড়া করা হইয়া গেছে। মাসিক ভাড়া সাড়ে পাঁচ টাকা শুনিয়া চাঁপা প্রথমে একটু দমিয়া গিয়াছিল। বনমালী আশ্বাস দিয়া কহিল, "সাড়ে পাঁচ টাকা তো একদিনের কামাই চাঁপা। পূজোর বাজারে একদিনে কাগজের হাতী আর নৌকো বেচে তোমার বছরের ভাড়া তু'লে দেব।" চাঁপা হাস্যময় স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে বনমালীকে পুরস্কৃত করিল।

রং বেরং কাগজের ফুল দিয়া বনমালী তুইদিন ধরিয়া ঘরখানি সাজাইয়া ফেলিল। দোকান সাজান হইলে চাঁপার সঙ্গে তাহার তুই একজন বান্ধবী সন্ধ্যাকালে দোকান দেখিতে আসিল। কি চমৎকার! সমস্ত ঘরখানিতে যেন হাজারখানেক রঙ্গিন প্রজাপতি উড়িয়া আসিয়া বসিয়াছে। শিল্পীকে প্রশংসা করিয়া মণি বৈষ্ণবী চাঁপার কাণে কাণে কহিল, "বড় ভাগ্যিরে তোর চাঁপা। দেখিস আবার হেলায় হারাস নি যেন!" চাঁপা লজ্জায় লাল হইয়া গেল।

সেদিন ফিরিতে তাহার রাত্রি হইল। সে একেবারে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে দোকান খুলিবার দিন পর্য্যন্ত জানিয়া আসিয়াছে। মাথায় মুড়ীর ডালিতে দিস্তা খানেক খবরের কাগজ।

"এ কাগজ কি হবে চাঁপা?" বনমালী জিজ্ঞাসা করিল।

"ঠোঙ্গা গড়তে হবে যে। সবাই তো আর আঁচল পেতে মুড়ি নেবে না।" চাঁপা কহিল।

হাত বাড়াইয়া বনমালী কহিল, "দাও। রাতে ক'রে রাখব।"

"সারাদিন মেহনৎ করেছ, আবার সারারাত জাগতে চাও? তোমার সখ তো খুব!"—এই বলিয়া চাঁপা একেবারে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

আহারান্তে নিজের ঘরে চাঁপা ঠোঙ্গার জন্য কাগজ কাটিতে বসিয়া গেল। কাল দোকানের অন্যান্য আসবাব-পত্র যোগাড় করিতে হইবে। হাতে কাঁচি চলিতেছিল আর চাঁপার সমস্ত মন তখন মুড়ি মুড়কির দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া নবীন সরকারের মনোহারী ও গোপাল গোয়ালার সন্দেশের দোকান আশ্রয় করিয়া ঘুরিতেছিল। বেশ স্পষ্টই সে দেখিতে পাইতেছিল যে, বনমালী রীতিমত মোটা-সোটা হইয়া লাল খেরুয়ার বাঁধা খাতাখানিতে বড় বড় টাকার অঙ্ক কাঁদিতেছে। দোকানের সম্মুখে পথের ধারে অসংখ্য খরিদ্দার আর পিছনে কুঞ্জলতার বেড়ায় ঘেরা ছোট বাড়ীখানির আঙ্গিনায় বসিয়া সোনার সুতায় গাঁথা তুলসীর মালা লইয়া সে জপ করিতেছে। আরো যে কত প্রকারের সুখস্বপ্নই শরতের মেঘের মত একে একে তাহার মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল তাহার সংখ্যা নাই। সহসা চাঁপা চমকিয়া উঠিল। বনমালীর ছবি! খবরের কাগজে বনমালীর ছবি উঠিল কেমন করিয়া? তাড়াতাড়ি প্রদীপটীর কাছে আনিয়া ছবির নীচে লেখা কয়েক

ছত্রে চাঁপা চোখ বুলাইয়া গেল। নিমেষে কোথা হইতে এক অন্ধকারের বন্যা আসিয়া তাহার দোকান-পসার বাড়ী-ঘর সব ভাসাইয়া লইয়া গেল ; রহিল শুধু বনমালীর ছবি, কয়েক পংক্তি অক্ষর আর চাঁপা নিজে। পরমুহূর্ত্তেই দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস টানিয়া চাঁপা কহিয়া উঠিল, "উঃ !"

একখানি বাঙ্গালা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় বনমালীর ছবি, তাহার নীচে লেখা,—আমার ভ্রাতা শ্রীমান বনমালী বসু আজ ছয়মাস হইতে নিরুদ্দেশ। আমার মাতা তাহার জন্য অন্ন-জল ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই। শ্রীমান সামান্য কারণে রাগ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে। যিনি তাহার সন্ধান করিয়া দিবেন, তাঁহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

শ্রীকানাইলাল বসু, বর্দ্ধমান।

রাত্রি শেষ হইতে যখন দণ্ডখানেক বাকী ছিল, তখনও চাঁপা কাগজখানি সম্মুখে করিয়া আবিষ্টের মত বসিয়াছিল। সহসা কাকের ডাকে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে কি ভাবিল, তাহার পর ভিন্ গাঁয়ে তাহার মামাতো ভাই পোষ্টাফিসের পিওন জলধরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিয়া গেল।

বনমালী যখন সবে হাত-মুখ ধুইয়া বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া বসিয়াছে তখন চাঁপা ফিরিল। তখন বেলা হইয়াছে। বনমালী

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি হ'য়েছে তোমার চাঁপা ?" চাঁপা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কহিল, "কিছু না।" তাহার পর মুড়ি ভাজিবার অছিলায় সে বাহির হইয়া গেল, ফিরিল সন্ধ্যার পর।

বনমালী অত্যন্ত উদ্বেগে সমস্ত দিন কাটাইয়া সন্ধ্যার পথে দাঁড়াইয়া চাঁপার অপেক্ষা করিতেছিল, চাঁপাকে আসিতে দেখিয়াই কহিল, "আজ সারাদিন না দেখে কেবলই ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছি।" কথা শুনিয়া চাঁপার চোখে জল আসিল। আপনাকে কোনমতে সামলাইয়া সে জবাব দিল, "আজ রতন গাঁয়ে মুড়ির যোগান দিতে গেছলাম।"

বনমালী কহিল, "সারাদিন খাওনি তাহ'লে! হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও গে। ভাত-তরকারী ঢাকা আছে। আমি একবার দোকানটা দেখে আসিগে।" বনমালী চলিয়া গেল।

দাওয়ায় আঁচল বিছাইয়া চাঁপা ঘণ্টাখানেক গড়াইল, তার পর তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া ভাত লইয়া বসিল।

বনমালী তাহারই জন্য ভাত রাঁধিয়া গিয়াছে। বিধাতার কি পরিহাস! অন্নের প্রথম গ্রাসটি কপালে ঠেকাইয়া মুখে দিতে গিয়াই সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরক্ষণেই ভাতের থালা ঢাকিয়া রাখিয়া গেল।

সেদিন আর খাওয়া হইল না।

কয়দিন হইতে চাঁপা কেন এত বিমর্ষ আর গম্ভীর হইয়া আছে, বনমালী তাহা বুঝিতে পারিল না। চতুর্থ দিন আহারান্তে জিজ্ঞাসা

করিল, "কৈ? আজ যে দোকান খুলবে! সব আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দাও।"

চাঁপা একটি কথা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শুধু কহিল, "সে আজ থাক্।"

"কেন? সামনে পূজোর মরশুম, এখন থেকে গুছিয়ে না নিলে তখন কি করবে? একটা যে দোকান তাতো খদ্দেরের জানা চাই।" বনমালী কহিল।

চাঁপা তুলসীতলায় গোবর লেপিতেছিল, হতাশা উদাস-স্বরে অতি মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আর দোকান!"

বনমালী শুনিতে পাইল না, ফিরিয়া সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল। চাঁপা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "দোকানের কথা জানেন নারায়ণ। তুমি আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না।" বনমালী যদিও এ কথার অর্থ বুঝিল না, তথাপি চাঁপার মুখ দেখিয়া দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিয়া গেল।

বৈকালে তাহার ঘরের বারান্দায় মাথা নীচু করিয়া চাঁপা কাঁথা সেলাই করিতেছিল আর বনমালী বাহিরের ঘরের রোয়াকে পা ঝুলাইয়া বসিয়া অবিলম্বে দোকান খুলিবার পক্ষে বিবিধ যুক্তি দেখাইয়া অনর্গল বকিতেছিল। এমন সময় বাহিরের দরজার কাছে কে ডাকিল, "চাঁপা বোষ্টুমী বাড়ীতে আছ?" চাঁপা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক এক বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া আঙিনায় প্রবেশ করিলেন। অকস্মাৎ ভ্রাতা ও জননীকে দেখিয়া

বনমালী একেবারে বিমূঢ় হইয়া গেল। বৃদ্ধা বনমালীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। চাঁপা কোন কথা না বলিয়া বনমালীর ঘরের বারান্দায় একখানি মাদুর বিছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

* * * *

বাহিরে গরুর গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। রাঁধিবার অছিলায় চাঁপা একটি হাঁড়িতে শুধু জল চাপাইয়া রান্নাঘরে উনুন জ্বালিয়া বসিয়াছিল। এমন সময় ঝড়ের মত বনমালী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আমি চল্লাম, কিন্তু তুমি কেন আমার সঙ্গে চাতুরী করলে? আমাকে সইতে পার না বল্লেই তো আমি চ'লে যেতাম।" বনমালীকে দেখিয়া চাঁপা উঠিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল, বনমালীর অভিযোগের উত্তরে একটি কথাও কহিল না। একবার তাহার দিকে চাহিল মাত্র। বনমালী সে সজল চক্ষুর ব্যথাতুর দৃষ্টির অর্থ বুঝিল না। শ্লেষের স্বরে কহিল, "পাঁচশো টাকার লোভে বুঝি!" ভ্রাতা যে তাহার সন্ধানের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা সে জানিত।

বনমালীর কথা শুনিয়া চাঁপার চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল এমন সময়, "চাঁপা মা লক্ষী কোথা?" বলিতে বলিতে বনমালীর মাতা গৃহে প্রবেশ করিলেন, পরে চাঁপাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "আমি

চল্লুম মা, তুমি বুড়ীর হারানো ধর্ন ফিরিয়ে দিয়েছ, তোমার অক্ষয় বৈকুণ্ঠ হ'বে। আর বলবার কিছুই নেই, বুড়ীকে বাঁচিয়েছ ; যে ক'টা দিন বাঁচব নিত্য তোমার নামে নারায়ণকে তুলসী দেব। এই নাও, সংসারের কত দরকার কত রকম আছে, কাছে রাখ।” বলিয়া অনেক প্রকার আশীর্ব্বাদের সঙ্গে ছোট একটা পুঁটুলী তাহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। চাঁপা অপলক নেত্রে চলন্ত গো-যানখানির দিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় মণি বৈষ্ণবীর রাখাল মাণিক আসিয়া ডাকিল “চাঁপা দিদি ?” চাঁপার বাড়ীতে কে আসিয়াছে জানিবার জন্য মণি তাহাকে পাঠাইয়াছিল। মাণিককে দেখিয়া চাঁপার হুঁস হইল, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, “দয়াল হরি ! হরি হে।” তারপর রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করিতে গিয়া হাতের মুঠায় ছোট পুঁটুলিটি চোখে পড়িল। খুলিয়া দেখিল একশত টাকার পাঁচখানি নোট। পুরস্কার ! বিদ্রূপের হাস্যে চাঁপার ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে মাণিককে কহিল, “একটু দাঁড়াতো মাণিক ! দেখি আমি গাড়ীটা কতদূর গেল !”

* * * *

গাড়ী তখন কেবল বাবুদের দীঘি ছাড়াইয়া গেছে এমন সময় পিছন হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া মাণিক কহিল, “গাড়ী রাখ একটুখানি।” কানাইলাল মুখ বাহির করিয়া

কহিলেন, "কে ?" "আমি মাণিক ঘোষ। এই নিন চাঁপা দিদি পুঁটুলী ফিরিয়ে দিয়েছে"—বলিয়া পুঁটুলিটি গাড়ীর মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে বাঁকা পথে অদৃশ্য হইয়া গেল। বনমালী জিজ্ঞাস করিল, "কি ও দাদা ?"

কানাই কহিল, "সেই পাঁচশো টাকার নোট দেখছি ফিরিয়ে দিয়েছে !"

মুহূর্ত্তের জন্য বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া পরক্ষণেই বনমালীর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

চাঁপা আজও মাথায় করিয়া মুড়ী বেচে। সে দোকান ঘর তালা বন্ধ কিন্তু মাসে মাসে চাঁপা তাহার ভাড়া যোগাইয়া যায়। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে সন্ধ্যাদীপ দেয়, কেন তাহা কেহ বলিতে পারে না।

দুলাল

স্বর্গীয় পিতার একটি গুণ পূর্ণভাবেই পুত্র দুলালচন্দ্রে বর্তিয়াছিল। দুলালের পিতা চরণদাস বৈরাগী একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিল। তাহার রচিত মান-মাথুরের পালা আজও সাতপাড়া অঞ্চলে গাওয়া হয়। এখনও কোন বড় ওস্তাদ সে অঞ্চলে আসিলে মজলিসে বসিয়া ইতর-ভদ্র সকলেই স্বর্গীয় চরণদাসের কথা তুলিয়া দুটা গল্প করে।

দুলালকে তিন বছরেরটি রাখিয়া চরণ মারা যায়। সে আজ চার বছরের কথা। ইতিমধ্যে দুলালের মা শ্যামা বৈষ্ণবী গোবিন্দ বৈরাগীর সহিত কণ্ঠি বদল করিয়া আবার নূতন গৃহে সংসার পাতিয়াছে। তাহাতে দুলালের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। সে আগেকার মতই চারবেলা ভাত খায়, সমস্ত দিন বাড়ী-বাড়ী নাম কীর্ত্তন ও মান-মাথুরের এক-আধখানা ভাঙ্গা গান গাহিয়া বেড়ায়। গোবিন্দ প্রহার করিয়াও দুলালকে তার মুড়ী-মুড়কীর দোকানে কাক তাড়াইবার কাজে লাগাইতে পারে না।

এই প্রহার পিতার আমলে তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিনা সে কথা তাহার মনে পড়ে না, তবে এখন এটা নিত্যকার ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে; কাজেই প্রহার তার সহিয়াও গিয়াছে। সমস্ত

দিনের পর শুষ্কমুখে বাড়ী ফিরিয়া চারটি ভাত ও একঘটি জল খাইয়া মা'র আঁচলে মুখ মুছিয়া সে শয্যা লয়, পরদিন ঘুম ভাঙ্গিলে আবার একবাটি ভাত, গুড় ও তেঁতুলের সহিত উদরস্থ করিয়া প্রহরকালের জন্য দৈনন্দিন সঙ্গীতকলার অনুশীলনে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়।

কিন্তু সহসা একদিন এই নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রায় বাধা পড়িল।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া দুলাল দেখিল উঠানে জলচৌকির উপর ভদ্রবেশধারী একটি লোক, সম্মুখে তার মা ও গোবিন্দ; উভয়ে দাঁড়াইয়া পরম নিবিষ্ট চিত্তে সে লোকটির সহিত বাক্যালাপ করিতেছে। ভদ্রলোক দেখিলেই প্রণাম করিতে হয়,—খুব শৈশবেই চরণ তাহাকে এ কথা শিখাইয়াছিল। সে আসিয়া ঢিপ করিয়া আগন্তুকের পায়ের কাছে প্রণাম করিল। আগন্তুক দুলালের মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন, "বাঃ, বেশ সভ্য তো তোমার ছেলেটি, বোষ্টমী !"

শ্যামা কোনো কথা বলিবার পূর্ব্বেই ক্ষুধার্ত্ত দুলাল মা'র আঁচল টানিয়া কহিল, "ভাত দে মা।"

ভদ্রলোক কহিলেন, "আহা, যাও, যাও ভাত দাও গে, কথা তো হয়েই আছে, সন্ধ্যা হ'লেই আগাম টাকাটা দিয়ে যাবো'খন।"

শ্যামা দুলালের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল।

ভদ্রলোকটি কলিকাতার 'সুরেন্দ্র থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি'র ম্যানেজার। তিনি এদিকে তাঁর শ্যালিকার গৃহে বেড়াইতে

আসিয়াছিলেন। কাল সন্ধ্যায় সেখানে হরিসংকীর্ত্তনে দুলালের গান শুনিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে এমন মিষ্ট কণ্ঠে তান-লয়-শুদ্ধ গান তিনি আর কখনো শোনেন নাই। তাই গান শুনিয়া ছেলেটির প্রতি তাঁহার লোভ হয় এবং সন্ধান লইয়া গোবিন্দের সঙ্গে শ্যামার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গোবিন্দের মোটেই আপত্তি নাই। তবে শ্যামা? শ্যামাও মাসিক এক-কুড়ি টাকা মাহিনা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল—তবু ছেলে দূরে চলিয়া যাইবে, এ কল্পনায় মন তার বেদনায় আর্ত্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু টাকা! এক মাসের মাহিনা নগদ হাতে পাইবে, তাছাড়া ছেলের ভবিষ্যতেরও একটা হিল্লে হইয়া যাইবে! মনকে বুঝাইয়া শ্যামা দুঃখ ভুলিবার চেষ্টা করিল।

মা'র মুখে অন্যত্র যাইতে হইবে শুনিয়া দুলাল শঙ্কিত দৃষ্টিতে মা'র দিকে চাহিয়া যখন কহিল, "মা, আমি যাব না" তখন এ কথায় শ্যামার মনে আবার সেই বেদনা জাগিয়া উঠিল। গোবিন্দ রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া কহিল, "তুমি উঠে এসোনা। বাবু কি বলছেন, টাকা ক'টি নেবে কিনা?"

এক-কুড়ি টাকা চট্ করিয়া ফেলিয়া দিতেও শ্যামার মন সরিল না। দুলালের দিকে না চাহিয়া সে বাহিরে আসিল এবং আরো কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর নোট দু'খানি আঁচলে বাঁধিয়া আগন্তুকের পা ধরিয়া কহিল, "আপনি আমার বাপ! ও'টি বৈ আমার আর কেউ নেই। দেখবে, আপনার হাতেই ওকে তুলে দিচ্ছি!"

আগন্তুক গোপাল বণিক সহাস্যে কহিলেন, "ছ'মাস পরে চিনতে পারবে না বোষ্টুমী, তোমার এই ছেলেকে। "শ্যামা তথাপি বার-বার করিয়া বলিয়া দিল; তাহার ছেলে কি কি খাইতে ভালবাসে কি তার সাধ, এই সবের মস্ত ফর্দ্দ সে দিতে চলিল। গোপাল বণিক ধৈর্য্য-সহকারে সব কথা শুনিয়া কহিলেন, "কিছু ভেবো না, দু'বেলা ভাত-মাছ তো আছেই—তাছাড়া লুচী-মেঠায়ের ছড়াছড়ি। পূজোর পর ছেলে এলে তার মুখেই সব শুনতে পাবে গো!" শ্যামা আশ্বস্ত হইল, দুলাল কিন্তু সারারাত মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কেবলই কহিতে লাগিল, "আমি যাবো না মা, আমি যাবো না।" গোবিন্দ দু'বার তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে রাজী করাইবার চেষ্টা করিল। শ্যামা কহিল, "আহা, মেরো না—আমি বুঝিয়ে বলচি।"

শ্যামা অনেক করিয়া বুঝাইল, মিঠাই, মোণ্ডা, কেমন রঙীন ঝক্‌মকে সাজ-পোষাক, কত আদর! তার উপর কলিকাতা সহর—কত গাড়ী-ঘোড়া কত বড় বড় বাড়ী, লোকজন! এত প্রলোভনের কথা শুনিয়াও দুলাল কহিল, "সেখানে যে তুমি নেই।"

শ্যামা অঞ্চলে চোখ মুছিল। দুলাল কহিল, "তুমি যা'বে সঙ্গে?" শ্যামা এ কথার একটা জবাব খুঁজিয়া পাইল, কহিল, "তুই আগে যা, তারপর আমাকে চিঠি দিলেই আমি যাবো।" এ ব্যবস্থায় দুলাল রাজী হইল।

পরদিন প্রাতে গোপাল বণিকের হাতে পায়ে ধরিয়া অনেক মিনতির সহিত ছেলেকে দেখিবার অনুরোধ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্যামা দুলালকে বিদায় দিল। রাত্রির কথা ভুলিয়া প্রাণপণ শক্তিতে দুলাল মা'র অঞ্চল-প্রান্ত মুঠা করিয়া ধরিয়াছিল —গোবিন্দ আসিয়া মুঠা খুলিয়া দুলালকে টানিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "গাড়ী ছাড়্।" গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। দুলাল কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া কহিল, "কাল চিঠি দেবো মা—চ'লে আসিস!"

গাড়ী পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। শুধ্ একটা আর্ত্ত ভগ্ন কণ্ঠস্বর বাতাসকে নিমেষের জন্য ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

(২)

চিৎপুর রোডের উপর তিন-তলা বাড়ী। তেতালার একটি ঘরের বাহিরে বড় সাইনবোর্ডে লেখা—"সেই সুপ্রসিদ্ধ সুরেন্দ্র থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা-পার্টি। স্বত্বাধিকারী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাহা। ম্যানেজার শ্রীগোপালচরণ বণিক।" গৃহের অভ্যন্তরে অনেকগুলি ছেঁড়া মাদুর বিছানো। তাহার উপর মাঝে মাঝে বালিশ, ছিন্ন আবরণ-শূন্য। ইতস্ততঃ অনেকগুলি বই। অধিকাংশই যাত্রার পালা, খান-কয়েক সচিত্র প্রেমলিপি, থিয়েটার সঙ্গীত, পাঁচালী ও কবির লড়াই। ঘরের কোণে গুটি-কয়েক বাক্স, তাহাদের গায়ে নানা বর্ণের লেবেল আঁটা। বাক্সগুলির উপর কয়েক জোড়া

তবলা ও খঞ্জনী ; দেওয়ালের উপর দিকে খান-কয়েক নগ্ন নারীর বিলাতী ছবি, একটা কুলুঙ্গিতে একটি গণেশের সিঁদুর-মাখা মাটীর মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটীর পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো একটি গাঁজার কলিকা। দেওয়ালের নীচের দিকে ও গৃহের প্রত্যেকটি কোণ পানের পিকে বিচিত্রিত। তখন বেলা এক প্রহর। মেঝেয় বসিয়া কয়েকজন অভিনেতা আয়নার সামনে বিচিত্র-ভাবের মুখভঙ্গী করিতেছিল।

গৃহের কোণে একটি ছিন্ন তাকিয়ায় বুক রাখিয়া স্বত্বাধিকারী মহাশয় গড়্গড়ার নল মুখে দিয়া দৈনিক জমা-খরচের খাতা পরীক্ষা করিতেছিলেন।

এই সময় দুলালকে লইয়া ম্যানেজারবাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বত্বাধিকারী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখুন, এনেচি। তৈরি করে' নিতে পারলে ভড়ের "সীতা-নির্ব্বাসন" একেবারে কাণা!"

স্বত্বাধিকারী মহাশয় গড়্গড়ার নল ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "এ যে একেবারে খোকা দেখচি। পারবে কি?"

"পরখ করেই নিন না।"

"আচ্ছা, একটা গাও তো খোকা।" দুলালের অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। সে কহিল, "বড্ড খিদে পেয়েছে।"

ম্যানেজারবাবু চাকর ডাকিয়া দু' পয়সার মুড়ি আনিবার আদেশ দিয়া কহিলেন, "আসচে খাবার—তুমি ততক্ষণ একটা গেয়ে ফ্যালো তো।"

দুলাল ভূমিতলে বসিয়া হাত নাড়িয়া একটা পদ কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। নিত্যকার মত আজকে গানে প্রাণ তার লুটাইয়া পড়ে নাই, তবু স্বত্বাধিকারী ও অভিনেতার দল বিমুগ্ধ হইল। স্বত্বাধিকারী বলিলেন, "চলবে। ভালই চলবে। তবে রাখতে পারলে হয়।" তারপর দুলালের গৃহের সংবাদ শুনিয়া কহিলেন, "না, পালাবার ভয় নেই। আজ থেকেই তালিম দিন। কুশের পাটটায় গান আছে, আর দু'একটা চণ্ডীদাসের পদ জুড়ে দিলে ছোকরার সুবিধে হবে।" সেই দিন হইতেই দুলালের শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

বৈকালে দুলাল জানালা দিয়া বাহিরের জগৎটাকে দেখিয়া লইল। এই কলিকাতা সহর! লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া! দুলালের এ-সব মোটে ভাল লাগে না। গাঁয়ের সঙ্গীদের কথা মনে পড়িতে লাগিল। আর মনে পড়িল সেই বাবলা গাছের সারি, সেই বাঁশঝাড় ও গাব গাছের অন্তরালে তাদের সেই ক্ষুদ্র গৃহখানি! অদূরে এক স্যাকরার দোকানে বসিয়া একটি ছোকরা বাঁশী বাজাইতেছিল,—কি করুণ সুর! দুলালের মনটা উদাস হইয়া উঠিল।

মা'র কথা মনে পড়িল! মা এখন কি করিতেছে? সেকথা মনে হইতেই দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। বাহিরের বিশ্ব সে জলে ভাসিয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল—আর অশ্রুর আবছায়ার মধ্যে মা'র মূর্ত্তি সহস্ররূপে তার সামনে ঘুরিয়া ফিরিতে

লাগিল। জানলার গরাদে দুই গাল চাপিয়া অস্পষ্ট স্বরে সে ডাকিল, "মা, মা, মাগো!"

কতক্ষণ কাঁদিয়া সে ম্যানেজারবাবুর কাছে গিয়া কহিল, "আমি থাকতে পারবো না এখানে, মা'র কাছে যাব।"

ম্যানেজারবাবু তখন দু'পয়সার ফুলুরির সঙ্গে বৈকালিক চা পান করিতেছিলেন, দুলালের কথা শুনিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "সোনার চাঁদ আর কি! যা, ওপর-তলায় বোস্‌গে। এখনি মাষ্টার আসবে।" বিষণ্ণ-ম্লান মুখে দুলাল চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় মোশন-মাষ্টার আসিয়া দুলালকে নানা ভাবে পরীক্ষা করিয়া স্বত্বাধিকারীকে কহিলেন, "ছেলেটা খুব ভালই মিলেছে, বাবু। টিঁকে থাকলে আসচে পূজোয় 'নরমেধ যজ্ঞ' খুব ভাল উৎরে যাবে।"

দুলালের শিক্ষা সুরু হইল। সেই সঙ্গে দু'বেলা চার পয়সার মুড়ি-মুড়কী জলখাবারেরও বন্দোবস্ত হইয়া গেল। ম্যানেজার-বাবু দুলালকে রাস্তায় বাহির হইতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন। 'সুরেন্দ্র থিয়েট্রিক্যালের' প্রতিদ্বন্দ্বী 'নিতাই অপেরা'র ঘর রাস্তার মোড়ে। সে দলের অভিনেতারা সর্ব্বদাই সন্ধান লইয়া বেড়াইতেছে। এমন একটা রত্নের সন্ধান পাইলে তারা তাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে! গত বৎসর তাদের একটি ছেলেকে ভাঙ্গাইয়া নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক 'সমুদ্র-মন্থন'কে এরা একেবারে জখম করিয়া দিয়াছিল।

দুলালকে সতর্ক করিয়া ম্যানেজারবাবু দরোয়ান, চাকর ও অভিনেতাদিগকে এই বালকটির দিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। ইট-কাঠের আবেষ্টনে অনেকগুলি দৃষ্টির শৃঙ্খলে পল্লীর দুলাল বন্দী রহিল। মন তার সারাদিন পড়িয়া থাকিত তার সেই গ্রামের মাঠ-ঘাটের মধ্যে! বেলা দশটায় ভাত খাইতে বসিয়া প্রথম যে অন্নের গ্রাসটি সে মুখে তুলিত, সেটা প্রত্যহই অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইত। যেদিন মা'র কথা বেশী করিয়া মনে হইত, সেদিন অন্ন আর মুখেও রুচিত না। ইতিমধ্যে ম্যানেজারবাবুকে অনুরোধ করিয়া সে মা'র কাছে একখানা চিঠি পাঠাইয়াছিল। ম্যানেজারবাবু একখানা সাদা পোষ্টকার্ড লিখিয়া বিনা মাশুলেই সেখানা পোষ্ট করিয়াছিলেন। দুলাল জানিত যে পত্রপাঠ মাত্র মা এখানে আসিবে। কাজেই দিনকয়েক বিনা বাক্যব্যয়ে সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু চিঠি পাঠাইবার দিন হইতে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনিলেই ছুটিয়া গিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিত এবং পর মুহূর্তেই মুখখানা ছোট করিয়া ফিরিয়া আসিত।

এমনিভাবে দেড় মাস কাটিয়া গেল। প্রত্যহ প্রত্যূষের আশা সন্ধ্যায় একেবারে বিলীন হইয়া যাইত। তথাপি দুলাল মা'র আগমন সম্বন্ধে নিরাশ হইতে পারিল না। এই আশা ও নৈরাশ্যের অবকাশে দুলালের শিক্ষা সমাপ্ত হইল।

(৩)

পূজা আসিতেছে। যাত্রার দলের নূতন পালা "সীতার বনবাস" নাটকের বিজ্ঞাপন বড় বড় রক্তাক্ষরে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া গেল। জোড়াসাঁকোর বারোয়ারিতলায় এই যুগান্তকারী নাটকের প্রথম অভিনয় হইবে, স্থির হইয়া গিয়াছে।

অভিনয়ের দিন প্রতঃকালে দুলাল কাঁদিতে কাঁদিতে ম্যানেজারের কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল, "আমি মা'র কাছে যাব।" ম্যানেজার তাহার কথা শুনিয়া দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিল, "তুমি বেশ ত' ছোক্‌রা! আজ প্লে, আর তুমি যাবে মা'র কাছে! আব্বার আর কা'কে বলে!" দুলাল বুঝিল যাওয়া হইবে না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে চলিয়া গেল।

রাত্রে অভিনয় আরম্ভ হইল। সত্ত্বাধিকারী দেখিল ম্যানেজার মিথ্যা বলে নাই। কুশের অভিনয়ে দুলাল যে দক্ষতার পরিচয় দিতেছিল তাহা অপূর্ব্ব। তাঁহার যাত্রার ইতিহাসে এমনটি দেখা যায় নাই। শ্রোতার দলও মুগ্ধ হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বারই দুলালের আগমনের সঙ্গে করতালিধ্বনিতে তাহাকে উৎসাহিত করিতেছিল। দুলালের চরম কৃতিত্ব ফুটিল শেষ দৃশ্যে,—রামায়ণ-গানের অবসারে যখন সীতা আসিলেন একবং কুশবেশধারী দুলাল যখন "এই যে মা" বলিয়া সীতাকে জড়াইয়া ধরিল। শ্রোতদের চক্ষু সে মিলন-দৃশ্যে ছল-ছল করিয়া উঠিল। বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে

অভিনয়ের কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মা, মা, মাগো।"

তাহার এই ক্রন্দনে আর ভগ্ন কণ্ঠস্বরে কিছুকালের জন্য শ্রোতৃমণ্ডলী যাত্রার আসর ভুলিয়া যেন কোন্ সুদূর অতীত লোকে গিয়া উপস্থিত হইল। স্বত্বাধিকারী হইতে বেহালাদার পর্য্যন্ত দুলালের এই শেষ দৃশ্যের অভিনয়ে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহাদের জীবনে যাত্রার আসরে এমন জীবন্ত অভিনয় করিতে তাহারা আর কাহাকেও দেখেন নাই।

গান ভাঙ্গিল। চিকের আড়াল হইতে একটি রমণী একখানা বহুমূল্য শাল কুশের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। পুরুষদের দলেও দু'একজন পুরস্কার দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন দুলালের ডাক পড়িল। কিন্তু খুঁজিয়া কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না।

অভিনয় শেষে দুলাল সাজ-ঘরে আসিয়া পোষাক ছাড়িয়া অপরের অলক্ষিতে একেবারে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তার সমস্ত অন্তর মা'র বুকে ফিরিয়া যাইবার জন্য অধীর আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। যাত্রার দলের সাজ-ঘর, ম্যানেজার ও মাষ্টারের প্রশংসা, শ্রোতাদের উৎসাহ-বাণী এ সব কিছু নয়, কিছু নয়, কিছু নয়! প্রশ্ন করিতে করিতে সে একেবারে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু পয়সা চাই—টিকিট কিনিতে হইবে। নইলে তো চড়িতে দিবে না! উপায়? প্লাটফর্ম্মের এদিক-ওদিক বৃথা ঘুরিয়া ক্লান্ত-পদে গিয়া সে একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া

পড়িল। দুই চোখ মুদিয়া আসিতেছিল—সে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্ম জনশূন্য হইয়া আসিয়াছে।

দুলাল স্বপ্ন দেখিতেছিল, সে যেন মা'র কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে, মা'র বুকে মাথা রাখিয়া বলিতেছে, "আমি যাবো না, আর যাবো না মা।" মা তাকে বুকে টানিয়া বলিতেছে, "না, বাবা, না, আর তোমায় যেতে দেবো না।" সহসা মাথায় আঘাত পাইয়া সে উঠিয়া বসিল। চোখ চাহিয়া দেখে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া ম্যানেজার আর চাকর ভোলা। তারা খোঁজ করিয়া একেবারে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত। ম্যানেজারকে দেখিয়াই দুলালের মুখ শুকাইয়া গেল। সে কাঁদিয়া কহিল, "আমি মা'র কাছে যাবো।"

চোখ রাঙাইয়া দুলালের কাণ ধরিয়া তাহাকে বেঞ্চ হইতে নামাইয়া ম্যানেজার কহিল, "হতভাগা! কম ভোগান ভুগিয়েচো! যাওয়াচ্ছি মা'র কাছে..." বলিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠাইয়া চিৎপুর রোডের দিকে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

যাত্রার দলে যে আসে সেই দু'দশ দিনে পোষ মানিয়া যায়—আর এ ছেলেটা বাগ মানিবে না! অধিকারী মহাশয় রাগে গম্‌গম্‌ করিতেছিলেন। এই সময় ম্যানেজারের সহিত ঘরে প্রবেশ করিয়া দুলাল নতমুখে অপরাধীর মত দাঁড়াইল। দেখিবামাত্র পা হইতে চটি খুলিয়া অধিকারী তাকে প্রহার

করিলেন। দুলাল বিনা বাক্যে সে প্রহার পিঠ পাতিয়া গ্রহণ করিল। তারপর একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

সারাদিন না খাইয়া ঘুমে কাটাইয়া সে সন্ধ্যায় যখন উঠিল, তখন মাথা বিষম ভার বোধ হইতেছে। দুই চোখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, জ্বালা করিতেছে! শরীর এমন যে নড়িবার সাধ্য নাই। গা তাতিয়া আগুন। প্রবল জ্বর! অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইয়াছিল, জলপানের জন্য নীচে সিঁড়ির উপর পড়িয়া গিয়া দুলাল কাঁদিয়া উঠিল। ম্যানেজার ও দুই-একজন অভিনেতা আসিয়া তাকে তুলিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। রাত্রে কুড়ি গ্রেণ কুইনিন খাওয়াইয়াও ম্যানেজার দুলালের জ্বর ছাড়াইতে পারিলেন না। শেষ রাত্রি হইতে দুলাল গান গাহিতে সুরু করিল,—

"এই তো এসেছিস মা—
এবার আমায় কর মা কোলে—
বনবাসের বড় জ্বালা মা!"

পাড়ার একটা ডিস্‌পেন্সারির কম্পাউণ্ডার আসিয়া দেখিয়া বলিয়া গেল, বিকার।

সন্ধ্যায় দুলালের গান থামিল, সঙ্গে সঙ্গে সেও ইহজীবনের মত ম্যানেজার ও অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে শেষ-বিদায় লইয়া গেল।

*   *   *   *

গ্রামের তিন ক্রোশের মধ্যে এক জায়গায় পূজার সময় দুলালের সেই যাত্রার দলের বায়না ছিল। ছেলে দুলালও সঙ্গে আসিবে—তা'কে তা'র অতি প্রিয় খাদ্য নূতন ধানের চিঁড়া খাওয়াইবে বলিয়া শ্যামা আর একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে চিঁড়া কুটিতেছিল। এমন সময় পিয়ন শ্যামা বৈষ্ণবীকে এক মণি-অর্ডার আনিয়া দিল।

মণি-অর্ডারের কমিশন-বাদ দুলালের প্রাপ্য মাহিনা ন' টাকা ছ' আনা অধিকারী মহাশয় পাঠাইয়া দিয়াছেন। শেষের ছত্রে লেখা আছে, জ্বর-বিকারে ২৭শে ভাদ্র দুলাল মারা গিয়াছে।

শ্যামা টাকা কয়টা ছুড়িয়া ফেলিয়া চিঁড়ার কাঠাটি বুকে করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে দুলো—দুলাল···!"

পিওন চলিয়া গেল।

নিধিরামের বেসাতি

চৈতালীর আবাদ শেষ করিয়া নিধিরাম কলিকাতা আসিত, তাহার পর বর্ষা নামিতেই দেশে ফিরিত, এই কয়টি মাস প্রত্যহ দেখিতাম একচক্ষু নিধিরাম পাঠক মাথায় একটি ছোট লাল টীনের বাক্স চাপাইয়া হাঁকিয়া যাইতেছে, "চাই—ই চীনা-আ সিঁদুর।" আর তাহার পশ্চাতে নগ্নকায় শিশুর দল বাদল মিত্রের গলির তন্দ্রালস মধ্যাহ্নকে সচকিত করিয়া চীৎকার করিতেছে, "চাই-ই কানা ইঁদুর।" কবে ছন্দরসিক কোন্ শিশুকবি সিন্দূরওয়ালা নিধিরামের এই অপূর্ব্ব স্তববাণী প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। সম্ভবতঃ স্বয়ং কবিরও সে কথা মনে নাই, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতি বৎসর নব নব শিশু-কণ্ঠ একই ভাষায় নিধিরামকে অভ্যর্থনা করিয়া আসিতেছিল। এই বিরূপ সম্বর্দ্ধনায় নিধিরাম কোনও দিন রাগ করে নাই, প্রত্যুত্তরে মূষিকের অনুকরণে শব্দ করিয়া তাহার শিশু-বন্ধুগণকে খুসী করিয়াছে, দেখিয়াছি।

বিশ বৎসর ধরিয়া এইরূপই চলিতেছিল, সহসা একদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া নিধিরাম আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গলির মধ্যে একস্থানে গুটিকয়েক শিশু জটলা করিতেছিল, নিধিরাম

সেখানে আসিয়া গলার স্বর উঁচু করিয়া হাঁকিল, "চাই-ই চীনা-আ সিঁদুর !" দূর হইতে দুই-একটি কণ্ঠে পরিচিত প্রতিধ্বনি শোনা গেল বটে, কিন্তু প্রত্যহের মত তাহা জমাট বাঁধিয়া উঠিল না।

শিশুর দল নীরবে পরম সম্ভ্রমের সহিত একজনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। নিধিরাম নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কথা কহিতেছিল একটি বালিকা। কোমরে নীলাম্বরী শাড়ীর অঞ্চল জড়াইয়া হাত নাড়িয়া সে প্রতিপন্ন করিতেছিল যে, কাণাকে কাণা এবং খোঁড়াকে খোঁড়া বলিতে নাই এবং যদি কেহ বলে, তবে তাহার সহিত বক্তার জন্মের মত আড়ি এবং পুতুলের বিবাহে সে তাহাকে কদাচ নিমন্ত্রণ করিবে না। সমাজ-চ্যুতির এই নিদারুণ শাস্তির ভয়ে পরিচিত কণ্ঠধ্বনি শুনিয়াও শিশুর দল আজ নীরব হইয়াছিল, নিধিরাম তাহা বুঝিল এবং বক্তাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া গেল।

সন্ধ্যায় ফিরিবার পথে গলির মোড়ে নীলবাড়ীর দরজায় দ্বিপ্রহরের শিশুসভার এই নেত্রীটির সহিত নিধিরামের সাক্ষাৎ পরিচয় হইল। নিধিরামকে দেখিয়াই বিনা ভূমিকায় বালিকা কহিল, "তুমি বুঝি আর-জন্মে কাণাকে কাণা ব'লেছিলে সিঁদুর-ওয়ালা ?" বলা বাহুল্য জন্মান্তরের কথা নিধিরামের স্মরণ ছিল না। শুধু এই নবাগতার সহিত আলাপ জমাইবার অভিপ্রায়ে সে কহিল, "হাঁ মা লক্ষ্মী।"

"মা বলেছে তাই এ জন্মে তুমি কাণা হ'য়েছ, না ?" বলিয়াই

সে এক প্রচণ্ড অভিশাপ-বাণী উচ্চারণ করিল, "যদু, মধু, ছোট্কু, নিমাই সব্বাই আর-জন্মে কাণা হ'বে! তোমাকে খেপায় কি না।"

নিধিরাম দাঁতে জিভ কাটিয়া কহিল, "ও কথা বলতে নেই মা লক্ষ্মী!" 'মা লক্ষ্মী' এইবার রুখিয়া উঠিয়া কহিল, "বলব, একশো বার বলব! তারা কেন তোমাকে কাণা বলবে?" বলিয়াই একটু থামিয়া সে প্রশ্ন করিল, "তুমি বামুন?"

নিধিরাম কহিল, "হ্যাঁ।"

প্রশ্নকর্ত্রীর চক্ষে সংশয় ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল,"দেখি পৈতে?" নিধিরাম ছিন্ন মেরজাইয়ের মধ্য হইতে মলিন উপবীতগুচ্ছ বাহির করিয়া দেখাইল। বালিকা কহিল, "কাল রাধুর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে। তুমি মন্তর পড়াবে?"

নিধিরাম তৎক্ষণাৎ পৌরহিত্য স্বীকার করিয়া কহিল, "পড়াব।"

"আমরা কিন্তু গরীব মানুষ, দক্ষিণে দিতে পারব না বুঝলে?" বলিয়া পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত বালিকা কহিল, "এইটি পার হ'লেই আমি বাঁচি। আর দু'টিকে এক রকমে বিয়ে দিইছি। মাগো, ছেলেমেয়ে মানুষ করা যে কি কষ্ট!" এই বলিয়া পুতুলের ডালাখানি নিধিরামের হাতে দিয়া সে কহিল, "দেখছ মেয়ের আমার মুখখানা রোদে একেবারে শুকিয়ে গেছে। এখন আবার জল দিয়ে রাখতে হবে, নৈলে পাড়ার লোকে বৌ দেখবার সময়

ঘোঁটা দিয়ে বলবে, বৌ কুচ্ছিৎ।" এমন সময় ভিতর হইতে আহ্বান আসিল, "সরু—"

"মাগো মা! দেখছ? দু-দণ্ড আপন ছেলেমেয়ের কথা কইবার যো নেই!" বলিয়া বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। পুতুলের ডালা তাহার হাতে দিয়া নিধিরাম কহিল, "তবে আসি মা লক্ষ্মী!"

"আমি লক্ষ্মী নইগো, সরস্বতী। আমাকে মা সরস্বতী ব'লে ডাকবে, বুঝলে?" এই বলিয়া বালিকা ভিতরে ঢুকিল। নিধিরামের সহিত সরস্বতীর পরিচয়ের সূত্রপাত হইল এই প্রকারে।

(২)

এই মুখরা মেয়েটিকে সহসা নিধিরামের অত্যন্ত ভাল লাগিয়া গেল! ক্রমে ক্রমে কালীঘাটের পুতুল, গালার চুড়ী, দু-এক টুকরা জরির কাপড় নিধিরামের সিঁদুরের বাক্সে আশ্রয় পাইয়া অবশেষে সরস্বতীর খেলাঘরে স্থানলাভ করিতে লাগিল। প্রত্যহের আনন্দহীন একঘেয়ে কেনাবেচার মধ্যে এই মেয়েটির সঙ্গে দু'দণ্ড কথা কহিয়া নিধিরাম আনন্দ পাইত; সময় সময় নীলবাড়ীর জানালার রোয়াকে সিন্দূরের পেট্‌রা কোলের উপর রাখিয়া নিধিরাম সরস্বতীর সহিত তাহার মাটির ছেলেমেয়েদের সুখদুঃখের কথা কহিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছে; ভিন্ন পল্লীতে গিয়া বেসাতি বেচিলে দশটা পয়সা রোজগার হয়, এ কথা মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে বটে, তথাপি তাহার প্রগল্‌ভা বান্ধবীর কথার মোহ

সে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ সে কথাগুলি একান্তই নিরর্থক এবং কোনো দিন নিধিরামেরও কোনও কাজে লাগিবার সম্ভাবনা ছিল না।

বর্ষা নামিলে নিধিরাম দেশে গেল।

সেবার দেশে মারাত্মক রকমের একটা ব্যাধির উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার আক্রমণ হইতে নিধিরামও নিষ্কৃতি পাইল না। মাস ছয় ভুগিয়া একদিন মাঘের দ্বিপ্রহরে নিধিরাম তাহার সিন্দুরের লাল বাক্সটি মাথায় করিয়া সরস্বতীর বাড়ীর দরজায় আসিয়া হাঁকিল, "চাই—ই চীনা-আ সিঁদুর।" আগেকার মত আর কেহ দুড়-দাড় করিয়া নামিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল না। দ্বিতীয়বার হাঁকিতে নীচের ঘরের একটা জানালা খুলিয়া গেল। জানালায় সরস্বতীকে দেখিয়াই এক গাল হাসিয়া নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল—"বুড়ো বেটার কথা মনে ছিল সরু-মা?" সরস্বতী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল। নিধিরাম আশ্চর্য্য হইল, সরস্বতী তো কথা না বলিয়া থাকিবার পাত্রী নহে! জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছেলে মেয়ে সব ভাল আছে সরু-মা?" এইবার সরস্বতী কথা কহিল, "সে সব আমি রাধুকে বিলিয়ে দিইছি।" ইহার পর আর কোনও প্রশ্ন করিবার সূত্র নিধিরাম খুঁজিয়া পাইল না। খানিক-ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অনেক ভাবিয়া সে কহিল, "একবার বাইরে আসবে মা?" সরু কথা কহিল না, পিছন হইতে সরস্বতীর কনিষ্ঠ ভাইটি কহিয়া উঠিল, "মা বলেছে দিদি আর বাইরে যাবে না।

দিদি বড় হ'য়েছে কি না।" ওঃ! তাই! এইবার নিধিরামের চক্ষে সরস্বতীর পরিবর্ত্তন ধরা পড়িল। এক বৎসর সে সরস্বতীকে দেখে নাই। কিন্তু বর্ষ পূর্ব্বে গৃহযাত্রার দিন সে যে মুখরা চঞ্চলা বালিকার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছিল তাহার সহিত এ মেয়েটির প্রভেদ বিস্তর। ইহার সহিত কি ভাষায় কোন উপলক্ষে কথা কহিবে তাহা সহসা নিধিরাম স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। ইতস্তত করিয়া বাড়ী হইতে যে পাটালী গুড় আনিয়াছিল তাহার পুঁটুলীটি জানালা গলাইয়া সরস্বতীর হাতে দিয়া নিধিরাম কহিল, "বাড়ী থেকে এনেছি সরু-মা, নিয়ে যাও।" তাহার পর নিজ গৃহ সম্বন্ধে দুই-একটি অসম্বদ্ধ কথা কহিয়া নিধিরাম চলিয়া গেল, গ্রামের কারিকরের দ্বারা যে বিচিত্র বর্ণের কাঠের পুতুলগুলি গড়িয়া আনিয়াছিল, সেগুলি আর বাক্স হইতে বাহির করিবার আবশ্যক হইল না।

পরদিন নিধিরাম প্রত্যহের বেসাতি লইয়া নীলবাড়ীর জানালায় দাঁড়াইল, নীচের ঘরে তক্তপোষের উপর বসিয়া সরস্বতী লেখাপড়া করিতেছিল, নিধিরাম মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "কি পড়ছ সরু-মা?" সরস্বতী মুখ তুলিয়া নিধিরামকে দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "কথামালা।" পরক্ষণেই প্রশ্ন করিল, "মা জিজ্ঞেস করেছে গুড়ের দাম কত?" প্রশ্ন শুনিয়া নিধিরাম থমকিয়া গেল; তাহার পর শুষ্ক-মুখে কহিল, "দিদিমাকে বোলো সরু-মা, আমার ঘরের তৈরী গুড়, পয়সা লাগেনি।" সরস্বতী কহিল, "আচ্ছা!"

ইহার পর আর দুই দিন সে পথে নিধিরাম আসিল না। তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্নে নিধিরাম যথারীতি নীলবাড়ীর জানালায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "সরু-মা!" সরস্বতী শ্লেট হইতে মুখ তুলিয়া একেবারে প্রশ্ন করিল, "দু'দিন কেন আসনি?" নিধিরামের মুখ উল্লাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহা হইলে সরু-মা তাহার কথা মনে রাখিয়াছে! অনুপস্থিতির একটি মিথ্যা কারণ নির্দ্দেশ করিয়া নিধিরাম অতি সতর্ক মৃদুস্বরে কহিল, "সরু-মা! একখানা বই এনেছি, পড়বে?" বলিয়া জানালা দিয়া একখানা বটতলার কৃত্তিবাসী বাঁধানো রামায়ণ চারিদিক চাহিয়া সরস্বতীর চৌকীর উপর রাখিয়া দিল। সরস্বতী ডাকিয়া জিজ্ঞাস করিল, "ছবি আছে?"

নিধিরাম হাসিয়া কহিল, "অনেক! রাম, রাবণ, হনুমান সবার ছবি। আমি পড়তে জানিনে সরু-মা, তুমি আগে প'ড়ে নাও, তারপর আমাকে প'ড়ে শোনাবে।"

সরস্বতী কহিল, "আচ্ছা। তুমি আবার কাল আসবে?"

নিধিরাম একটি সমুজ্জ্বল আনন্দ-হাস্যের সহিত সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল।

*　　*　　*　　*

সরস্বতী রামায়ণ পড়িত আর নিধিরাম সিন্দুরের পেট্‌রা কোলের উপর রাখিয়া জানালার রোয়াকে বসিয়া শুনিত। মধ্যে

যে ইটের দেয়ালের ব্যবধান ছিল, শ্রোতা ও পাঠিকার কাহারও তাহা মনে ছিল না! সহসা একদিন ব্যবধান বাড়িয়া গেল।

পাঠ যখন অযোধ্যাকাণ্ড পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, তখন একদিন নিধিরাম আসিয়া দেখিল যে, সরস্বতীর পরিবর্ত্তে নীচের ঘরে তক্তপোষের উপর দুইটি ভদ্রলোক পরিষ্কার বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতেছেন। নিধিরাম ডাকিল, "চাই—ই চীনা-আ সিঁদুর।" দোতালার একটা জানালা খুলিয়া গেল, সরস্বতী দাঁড়াইয়া বাম হাত মুখে দিয়া ডান হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে, সে আজ পড়িবে না! নিধিরাম যে পথে আসিয়াছিল সেই পথেই ফিরিয়া গেল। গলির মোড়ে সরস্বতীর সখী রাধারাণী ওরফে রাধু নিধিরামকে সংবাদ জানাইল যে, সরস্বতীর বিবাহ আসন্ন এবং পাত্র-পক্ষ দেখিতে আসিয়াছেন। সরু-মার বিবাহ! তারপর শ্বশুর-বাড়ী! সে কতদূর! নিধিরাম একবার ফিরিয়া দূরে নীলবাড়ীর দোতলার রুদ্ধ বাতায়নের দিকে চাহিয়া মন্থরপদে চলিয়া গেল।

তিন চারি দিন ঘরে কাটাইয়া আবার সেই পেট্‌রা মাথায় করিয়া নিধিরাম গলির মোড়ে আসিয়া একদিন হাঁকিল, "চাই—ই চীনা-আ সিঁদুর।"

সেদিন নীলবাড়ীতে নহবৎ বাজিতেছে, নিধিরাম অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, উপরের খোলা জানালার ধারে আজ আর আসিয়া কেহ দাঁড়াইল না।

পর দিন হইতে পুনরায় যথারীতি নিধিরামের কণ্ঠস্বর গলির সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতে লাগিল, শুধু নীলবাড়ীর সম্মুখ দিয়া নীরবে সে চলিয়া যাইত, শত চেষ্টাতেও কণ্ঠে কথা ফুটিতে চাহিত না।

(৩)

নিত্যকার মত সেদিনও নিধিরাম নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় নীলবাড়ীর জানালা হইতে একটি শিশু ডাকিল, "দাঁড়াও সিঁদুরওয়ালা! দিদি তোমাকে ডাকছে।" নিধিরামের বুক কাঁপিয়া উঠিল। ফিরিতেই সে দেখিল নীচের ঘরের জানালায় সরস্বতী দাঁড়াইয়া। নিধিরাম-আনন্দ গদ্‌গদ স্বরে কহিয়া উঠিল, "কবে এলে সরু-মা? আমি তো জানিনে তাই—"

সরস্বতী সংক্ষেপে কহিল, "আজ!" ইহার পর নিধিরাম ঘণ্টা খানেক ধরিয়া নিজেই অবিশ্রান্ত ক'ত কথা কহিয়া গেল। শেষে কহিল, "তোমার সিঁদুরের কৌটোটা আন তো সরু-মা। খুব ভাল উজ্‌লি সিঁদুর আছে।"

সরস্বতীর সোনার কৌটা সিঁদুরে ভরিয়া নিধিরাম সেদিনকার মত চলিয়া গেল। তাহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে বিচিত্র বর্ণের কাঠের কৌটায় সিঁদুরের উপঢৌকন আসিতে আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে তরল আলতা হইতে সুরু করিয়া শাঁখের কঙ্কণ পর্য্যন্ত এয়োতির কোনও সরঞ্জামই বাদ পড়িল না।

সেবার বর্ষায় আর নিধিরাম দেশে গেল না।

আশ্বিনে পূজার পূর্ব্বে সরস্বতী যেদিন শ্বশুর-গৃহে যাত্রা করিল, নিধিরামও সেইদিন দেশে গেল। বর্ষায় বাড়ীতে উপস্থিত না থাকিবার জন্য আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে এই বলিয়া স্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পর্য্যন্ত নিধিরামকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল কিন্তু আর্থিক ক্ষতির প্রকাণ্ড অঙ্কটি তাহাকে মোটেই বিচলিত করিল না।

* * * *

ফাল্গুনের বাতাসে কৃষ্ণচূড়ার গাছের ডালে রং ধরিয়াছে। নিধিরাম কলিকাতায় ফিরিল।

সরস্বতী শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়াছে কি না সে জানিত না। নীলবাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁকিল, "চাই—ই চীনা-আ সিঁদুর।" কোনো সাড়া আসিল না। নিধিরাম গলির পথে ফিরিয়া গেল কিন্তু কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া ডাকিল, "চাই—ই চীনা-আ সিঁদুর!"

অতি ক্ষীণ পদধ্বনি যেন শোনা গেল। নিধিরাম কম্পিত বক্ষে জানালার ধারে আসিয়া প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল। জানালা খুলিয়া সরস্বতীর ছোট ভাইটি কহিল, "তোমাকে এ পথে আসতে মা বারণ ক'রে দিয়েছে সিঁদুরওয়ালা।"

অজ্ঞাতে কোনও অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া নিধিরামের মুখ শুকাইল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে কহিল, "কেন?"

এমন সময় দরজা খুলিয়া গেল। দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল ম্লানমুখী শুভ্রবেশা নিরাভরণা সরস্বতী। নিধিরাম চমকিয়া উঠিল। তাহার পর মাথার পেট্‌রা মাটিতে নামাইয়া তাহার উপরে বসিয়া পড়িয়া অর্থহীন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল।

নীলবাড়ীর দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

সম্বিৎ পাইয়া যখন নিধিরাম ফিরিয়া চলিল, তখন তাহার মাথায় সিঁদুরের পেট্‌রা বিশ মণ ভারী হইয়া গিয়াছে।

ইহার পর আর সাত দিন সে গলিতে কেহ নিধিরামকে দেখে নাই। অবশেষে একদিন হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া জানলা খুলিলাম। নিধিরামের মূর্ত্তি দেখা গেল। সিঁদুরের পেট্‌রার পরিবর্ত্তে তাহার মাথায় একটি প্রকাণ্ড ফলের ঝাঁকা। তাহার গুরুভারে অবনত হইয়া বৃদ্ধ নিধিরাম পাঠক ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নীলবাড়ীর সম্মুখ দিয়া গলির পথে হাঁকিয়া যাইতেছে—"ফল চাই মা, পাকা ফল!"

পরের ছেলে

বুড়া শম্ভু সরকার স্বগ্রাম ঝাউডাঙ্গাতে পাঠশালা খুলিয়া গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ গুরুমহাশয়ের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; এই দীর্ঘকালের মধ্যে শুধু পূজার কয়েকদিন ছাড়া আর কেহ তাঁহার পাঠশালার দুয়ার বন্ধ দেখে নাই। তাই সেদিন হঠাৎ পাঠশালার দরজায় তালা বন্ধ দেখিয়া পাড়ার লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সন্ধ্যায় দুই-একজন প্রতিবেশী কৌতূহলী হইয়া সরকার মহাশয়ের সন্ধান লইতে আসিলেন। সরকার মহাশয় তখন বহুকালের পুরাতন ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে তাঁহার তিনখানি কাপড় ও দুইটি মেরজাই পাট করিয়া গুছাইয়া তুলিতেছিলেন। প্রতিবেশীরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি, সরকার মশাই?"

"চলছি দাদা, আর পারছিনে! দিনকয়েক ঘুরে আসি। মধু দাসকে ব'লে গেলাম, সে পাঠশালা দেখবে। বাড়ী-ঘর যেমন আছে থাকুক! আর কি হবে এসব!" বলিয়া ব্যাগটি তুলিয়া তাহার ওজন পরীক্ষা করিলেন, তারপর নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "রতন বৃত্তি পেয়েছিল দাদা!" বলিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে একখানি ভাঁজ করা কাগজ পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোকের হাতে তুলিয়া দিলেন। তিনি সেখানিতে একবার চোখ বুলাইয়া

কহিলেন, "এখানি আবার রেখেছেন কেন? দেখে মিছিমিছি মন খারাপ করা!"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি কাগজখানি লইয়া কহিলেন, "না থাক্!" তারপর বলিলেন, "বুড়োকে মনে রেখো ভাই সব, ফিরে আসলে আবার দেখা হবে। আর দেরী করবনা, দুর্গা শ্রীহরি! সিদ্ধিদাতা গণেশ!" বলিয়া বেতের মোটা লাঠিটার মাথায় ব্যাগ ঝুলাইয়া লাঠিগাছ কাঁধে করিয়া কহিলেন, "শুধু একটা কথা দাদা, আমি মধুকে ব'লে গেলাম তোমরাও মনে করিয়ে দিও, ছেলেগুলোকে যেন মার-ধোর না করে। কে কবে যাবে কে জানে? দু'দিনের জন্য আর কেন—দুর্গা শ্রীহরি!" শম্ভু সরকার বাহির হইয়া গেলেন।

রাম দত্ত কহিলেন, "পুত্রশোকে রাজা দশরথ মরেছিলেন, শম্ভু সরকার তো ছার! আহা রতন ছেলেটি বড় ভাল ছিল।"

শম্ভু সরকারের স্ত্রী রতনের জন্মের পরদিনই ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। শম্ভু সরকার আর বিবাহ না করিয়া নিজেই রতনের মায়ের স্থান অধিকার করিলেন। ক্রমে রতন বড় হইয়া পাঠশালায় ঢুকিল। এবার সে প্রাইমারী বৃত্তি-পরীক্ষা দিয়াছিল কিন্তু ফল বাহির হইবার মাসখানেক পূর্ব্বেই একদিনের জ্বরে হঠাৎ সে মৃত্যুলোকে প্রস্থান করিল। অসীম ধৈর্য্যের সহিত শম্ভু সরকার এই আঘাত সহিয়া গেলেন, পাঠশালা রীতিমত চলিতে লাগিল কিন্তু যেদিন পরীক্ষার ফল ও সেই সঙ্গে পুত্রের বৃত্তি

প্রাপ্তির সংবাদ বাহির হইল, সেদিন পুত্রশোক তাঁহাকে নূতন বাজিল। ঘরে আর কোনমতেই মন বসিতেছিল না; পাঠশালায় গিয়া যে স্থানটিতে রতন বসিত সেই দিকে দৃষ্টি পড়িত সকলের আগে, আর বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিত; কাজেই আজ শম্ভু সরকার ষাট বৎসর বয়সে জীবনে প্রথম গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে বাহির হইলেন।

(২)

মাস-পাঁচেকের মধ্যে তীর্থভ্রমণ শেষ হইল, সম্বলও ফুরাইয়া আসিল। তখন সরকার মহাশয় স্থির করিলেন যে, চাকুরী করিবেন; কিন্তু ভগ্নদেহ বৃদ্ধকে কাহারও কাজে লাগিল না। অগত্যা পদব্রজে দেশে ফিরিবার সঙ্কল্প করিয়া শম্ভু সরকার যাত্রা করিলেন।

কান্তপুরে আসিয়া প্রথম দিন সন্ধ্যা হইল। বাবুদের অতিথিশালায় রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতঃকালে যখন সরকার মহাশয় ইষ্টমন্ত্র জপিতেছিলেন সেই সময় একটি ছোট ছেলে আসিয়া পরম কৌতূহলের সঙ্গে শম্ভু সরকারের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "তুমি কে?" ছেলেটিকে সরকার মহাশয়ের ভালো লাগিল, তিনি মন্ত্রজপ ছাড়িয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "তুমি কে আগে বল।" সে কহিল, "আমি রতন।" রতন! শম্ভু সরকারের বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তুমি কার ছেলে?"

"বাবার ছেলে" রতন জবাব দিল। শম্ভু সরকার রতনের হাত ধরিয়া কহিলেন, "আমিও বাবার ছেলে, আমার নাম শম্ভু সরকার।" রতন তাড়াতাড়ি কহিল, "তুমি শম্ভু? বাবা যে তোমাকে ডাকছে! চল।" বলিয়াই শম্ভু সরকারের হাত ধরিয়া টানিল। সরকার মহাশয় বুঝিলেন যে শিশু ভুল করিয়াছে, তথাপি উঠিয়া কহিলেন, "চল যাই।" তখনকার মত তাঁহার মন্ত্রজপ বন্ধ রহিল।

বড়বাবু ফরাসে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, এমন সময় রতন শম্ভু সরকারের হাত ধরিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, "বাবা, তুমি যে ডাকছিলে, এনেছি।"

বড়বাবু হাসিয়া কহিলেন, "কাকে এনেছিস রে?"

"তুমি যে বললে শম্ভু সরকার!" রতন কহিল।

"আপনার নামও বুঝি শম্ভু সরকার, তাই খোকা আপনাকে টেনে এনেছে। আমি আমাদের নায়েব শম্ভু সরকারকে খুঁজ-ছিলাম। যাহোক আপনি বসুন।" শম্ভু সরকার আসন লইলেন। তারপর কথাবার্ত্তায় শম্ভু সরকার তাঁহার জীবনের সমস্ত কাহিনী আদ্যোপান্ত বলিয়া গেলেন, শেষে কহিলেন, "শেষ-জীবনে যদি কোথাও আশ্রয় পাই, তাহ'লে দিন ক'টা একরকমে কাটিয়ে দিই।"

বড়বাবুর দয়া হইল। কহিলেন, "এখানে থাকতে পারেন, আপত্তি নেই। খোকাকে একটু দেখবেন শুনবেন। দশ টাকা মাইনে, খোরাক পোষাক—পোষাবে?"

শম্ভু সরকার উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, "খুব ! খুব !! পরম দয়াল আপনি" ইত্যাদি ।

(৩)

প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঘণ্টাদুই করিয়া পড়াইবার বাঁধা সময় ছিল। কিন্তু ছাত্র ও শিক্ষক কেহই এই নিয়মের ধার ধারিতেন না। দিনের বারোঘণ্টার মধ্যে অর্দ্ধেক সময় রতন শম্ভু সরকারের ঘরেই কাটাইত, অবশ্য পড়া-শুনার কাজে নহে। সুদীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে যত প্রকার অদ্ভুত পশু-পক্ষীর সহিত শম্ভু সরকারের পরিচয় হইয়াছিল, তাহাদের সকলের কাহিনী সবিস্তারে তিনি তাঁহার এই শিশু ছাত্রটির নিকট বর্ণনা করিতেন, রতন খেলা ভুলিয়া পরম কৌতূহলের সহিত তাহা শুনিয়া যাইত। রতনের খেলার সাথীর সংখ্যাও কমিয়া আসিতেছিল ; মাষ্টার মহাশয়কে ছাড়িয়া অন্যত্র খেলিতে যাইতে তাহার মন সরিত না। অগত্যা সরকার মহাশয় নিজেই তাহার সহিত খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ষাট এবং ছয় এই উভয় সংখ্যার মধ্যে যে ব্যবধান আছে, সরকার মহাশয়ের আচরণে তাহা আর মনে করিবার কোনও উপায় রহিল না। তিনি কখনও ঘোড়া হইয়া তাঁহার শিশু ছাত্রটিকে পিঠে করিয়া ছুটিতেন, কখনও তাহার কাঠের গাড়ীখানিতে দড়ি বাঁধিয়া কাছারি বাড়ীর আঙ্গিনায় অসংখ্য কৌতূহলী দৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া পরম নির্ব্বিকার চিত্তে

টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। এইরূপে বৎসর খানেক কাটিয়া গেল।

ইতিমধ্যে শম্ভু সরকার দেশে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, পত্রের উত্তরে জানিলেন যে, বাড়ীর আঙ্গিনায় জঙ্গল জমিয়াছে এবং বাহিরের পাঠশালা ঘরের জীর্ণ দশা; আগামী বর্ষায় যদি টিঁকিয়া যায়, তবে বহুভাগ্য বলিতে হইবে। সংবাদ শুনিয়া তাঁহার কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা গেল না, তিনি তাঁহার শিশু ছাত্রটির অধ্যাপনায় পূর্ব্বের মতই মগ্ন হইয়া রহিলেন।

রতন সময়ে বাড়ী আসে না, অধিকাংশ সময় মাষ্টারের ঘরেই কাটাইয়া দেয়; ইহা কিন্তু রতনের মাতার একান্ত অপ্রীতিকর ছিল, এক-আধার আপত্তির আভাস কর্ত্তাকেও দিয়াছিলেন কিন্তু কর্ত্তা তাঁহার স্বাভাবিক ঔদাস্য বশতঃ সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এদিকে ছেলে পর হইয়া যাইতেছে এই আশঙ্কা মাতাকে ক্রমেই অধীর করিয়া তুলিতেছিল। সেদিন গৃহিণী সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, কথাটির একেবারে শেষ মীমাংসা করিয়া ফেলিবেন। কর্ত্তার আহার শেষ হইতেই তিনি কহিলেন, "ছেলেকে তো মাষ্টারের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তি ব'সে আছ! পড়া-শুনা করে কিনা তার খবরটা কি নিয়ে থাক? না মাস মাইনে গুণে দিয়েই খালাস!"

কর্ত্তা কহিলেন, "মাষ্টার ভাল, আমি বরাবর দেখছি।"

অনেক জিনিষ পুরুষলোক দেখিতে পায় না কিন্তু স্ত্রীলোকের

চক্ষে পড়ে,এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া গৃহিণী কহিলেন, "আচ্ছা একবার পরখ করেই দেখনা, ছেলে তো তোমারই।"

রতনের ডাক পড়িল এবং অনতিবিলম্বে পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া গেল; রতন অনায়াসে ধারাপাত ও বোধোদয়ের আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিয়া গেল। কর্ত্তা সহাস্যে কহিলেন, "দেখছ!"

পুত্রের কৃতিত্বে মায়েরও যে আনন্দ না হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু তখন উল্লাস প্রকাশ করাটা সমীচীন মনে করিলেন না এবং তখনকার মতন নীরব হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যায় গৃহিণী আবার কথা পাড়িলেন কিন্তু অন্য ভাবে। সেদিন রতনের সমবয়সী ও বাড়ীর যদু ইংরাজী বলিতেছিল, রতন কিছু বুঝিতে না পরিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিল, সে কথাটি কর্ত্তাকে জানাইয়া গৃহিণী কহিলেন, "দেখ একটু ইংরিজী শেখা তো খোকার দরকার। বড় হ'লে সাহেব-সুবোর সঙ্গে কথা কইতে হবে তো!"

কর্ত্তার কাছে কথাটি মূল্যবান মনে হইল। পাশ না দিক, বড় মানুষের ছেলের ইংরাজী না শিখলে চলে না এ ধারণা তাঁহারও ছিল। রতনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা, তুমি ইংরেজী পড় না?" রতন কহিল, "না বাবা। মাষ্টার মশাই তো পড়ান নি।"

কর্ত্তা কথা কহিলেন না, গৃহিণী কহিলেন, "মাষ্টার মশাই না পারেন তুমি খোকার ইংরিজী পড়বার জন্যে নতুন মাষ্টার ঠিক কর। ছেলেকে আমার মূর্খ ক'রে রাখতে পারবে না।"

রতন নীরবে মায়ের কথা শুনিল, তাহার পর মনে মনে ইংরাজী ভাষার মুণ্ডপাত করিতে করিতে চলিয়া গেল।

(৪)

পরদিন প্রাতে যখন রতন গত রাত্রির কাহিনী সবিস্তারে সরকার মহাশয়ের নিকট বর্ণনা শেষ করিল, শম্ভূ সরকারের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি অতি মৃদুস্বরে আপন মনে কহিলেন, "মায়া! মায়া! পরের ছেলে!"

রতন কথা কহিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শম্ভূ সরকার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে রতন, তুই ঠিক শুনেছিস গিন্নি-মা নতুন মাষ্টার আনতে চেয়েছেন?"

"হ্যাঁ, মাষ্টার মশাই। আমি কিন্তু পড়ব না, আমি মামাবাড়ী চলে' যাব।" রতন ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল।

সরকার মহাশয় রতনের মাথায় হাত বুলাইয়া অনেক চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "পড়বি বইকি বাবা, তা নৈলে কি বিদ্যে হয়?" পরক্ষণেই আবার প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা গিন্নি-মা আর কি বললেন? আর বাঙ্গলা পড়তে হবে না? কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী এসব তো পড়াই হয়নি, তুই বললিনে কেন?" "আমি বলিনি মাষ্টার মশাই।" রতন অসঙ্কোচে কহিল।

"তাই বল্, তা নইলে কি আর গিন্নি-মা ইংরিজী পড়তে বলেন? আচ্ছা আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলব।" গিন্নি-মাকে একটু

বুঝাইয়া বলিলেই তিনি বুঝিয়া যাইবেন এই ভরসায় শম্ভু সরকার একটু স্বস্তি লাভ করিলেন; তারপর কেবল বোধোদয়খানা খুলিয়া উদ্ভিদের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় কর্ত্তা ডাকিলেন, "সরকার মশাই!" আহ্বান শুনিয়া আপনার অজ্ঞাতেই শম্ভু সরকার কাঁপিয়া উঠিলেন।

কর্ত্তা আসন লইয়া দুই-একটি সাধারণ কথার পর বলিলেন, "খোকা তো এদিকে মন্দ শেখেনি দেখলাম। কিন্তু জানেন তো ইংরেজী শেখাও একটু দরকার। এখন থেকেই অল্প-স্বল্প কিছু পড়াশুনা করলে সহজেই কতকটা শিখে ফেলবে। আপনি কি বলেন?" কর্ত্তা ঘুরাইয়া বলিলেও শম্ভু সরকার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট বুঝিলেন, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন, "আজ্ঞে সে অতি যথার্থ কথা, রাজভাষা শেখাই তো উচিত।" "আপনি তাহ'লে একটু দেখবেন ও গ্রামের ইস্কুলের মাষ্টারেরা কেউ যদি—" বলিয়াই কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বুঝি ইংরেজী জানেন না?"

কোন সময় ইংরেজীর অক্ষর পরিচয় শম্ভু সরকারের হইয়াছিল, কিন্তু সেটাকে ইংরেজী জানা বলা যায় কি না তাহা তিনি তাড়াতাড়ি স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না, কহিলেন, "আজ্ঞে বাবু, আমরা সেকেলে মানুষ।"

কথাটা শেষ করিবার অবকাশ না দিয়া কর্ত্তা উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা আপনিও দেখবেন, আমিও খোঁজ নিচ্ছি।" কর্ত্তা বহির হইয়া গেলে সরকার মহাশয় রতনকে ছুটি দিলেন। রতন

বোধোদয়ের পাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই অত্যন্ত ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "আর পড়াবেন না মাষ্টার মশাই ?"

সরকার মহাশয় রতনকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "পড়াব বৈকি বাবা ! এখন যাও ধারাপাতটা একটু দেখগে, আমি ডাক্‌ব'খন।"

রতন খিড়কির পুকুরের পৈঠায় ধারাপাত খুলিয়া অনেক্ষণ বসিয়া রহিল কিন্তু মাষ্টার মহাশয় ডাকিলেন না। বেলা বাড়িলে সে ধারাপাতখানি বন্ধ করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের ঘরের দরজার কাছে উঁকি দিয়া দেখিল যে, মাষ্টার মহাশয় চক্ষু বুঁজিয়া শুইয়া আছেন। রতন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিল, "এক কড়া পোয়া-গণ্ডা, দুই কড়া আধ-গণ্ডা।" শম্ভু সরকার ঘুমান নাই, ডাকিলেন, "আয় রতন !" রতন ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলে সরকার মহাশয় কহিলেন, "আমি একটু তালবাড়ীতে যাচ্ছি রতন, বেলা পড়লে ফিরব। এ বেলা খাবনা, বলে দিস্।" চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া শম্ভু সরকার বাহির হইয়া গেলেন।

তালবাড়ী হইতে শম্ভু সরকার যখন ফিরিলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বড়বাবু বাহিরেই বসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার পেলেন সরকার মশাই ?" শম্ভু সরকার আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন, "আজ্ঞে না।" বলিয়াই হাতের বহিখানা চাদরের নীচে লুকাইয়া একেবারে আপনার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

বলাবাহুল্য, সরকার মশায় সত্য কথা বলেন নাই। তাল-বাড়ীর মাইনর স্কুলের সকল মাষ্টারেরই বড় বাড়ীর ছেলেটির উপর লোভ ছিল। শম্ভু সরকার একজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন কিন্তু বৈকালে তাঁহাকে শেষ কথা না দিয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। রতন অপরের কাছে পড়িবে ভাবিতেই তাঁহার মনে হইল যেন জগতের সহিত হৃদয়ের যে যোগসূত্রটি ছিল তাহা একেবারে ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে।

রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে। তালবাড়ী হইতে যে ফার্ষ্ট বুকখানি কিনিয়া আনিয়াছিসেন, শম্ভু সরকার তাহা খুলিয়া নূতন করিয়া ইংরেজী শিখিতে বসিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল তথাপি শম্ভু সরকারের ইংরেজী জ্ঞান কিছুমাত্র অগ্রসর হইল না। অক্ষরগুলি ক্রমাগতই ভুল হইতে লাগিল। বার-বার তন্দ্রা আর ক্ষীন স্মৃতিশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শম্ভু সরকার ক্লান্ত হইয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বহি বন্ধ করিলেন এবং অনতি-কাল মধ্যে পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রভাতে রতন আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে মাষ্টার মহাশয়কে ডাকে নাই। বেলা যখন দশটা তখন হঠাৎ বড়বাবুর খাস মুন্সির ডাকে শম্ভু সরকার ধড়্ফড়্ করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, "উঃ বড্ড বেলা হয়েছে দেখছি যে!" মুন্সি মহাশয় কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু অনেকক্ষণ থেকেই আপনাকে ডাকছেন।"

"বাবু ডাকছেন ! দুর্গা শ্রীহরি !" শম্ভু সরকার তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বাহির হইলেন।

কাছারি-ঘরের বাহিরে চৌকিতে বাবু বসিয়া, তাহার সম্মুখে কে ও ! তালবাড়ীর বিনোদ মাষ্টার ! সরকার মহাশয়ের মুখখানি একেবারে পাংশু হইয়া গেল। বড়বাবু সরকার মহাশয়কে ডাকিয়া কহিলেন, "আপনি এঁকেই বুঝি কাল ব'লে এসেছিলেন ? তা এঁর দ্বারাই চলবে।" শম্ভু সরকার বিনোদ মাষ্টারের দিকে একবার চাহিলেন, সে দৃষ্টিতে যে জ্বালা ছিল তাহাতে সত্যযুগ হইলে বিনোদ মাষ্টার ভস্ম হইয়া যাইতেন। বাবু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া কহিলেন, "আপনি রতনের ইংরেজী একটা বই কিনে এনে দিন আজই, বুঝলেন ?"

শম্ভু সরকার মাথা নোয়াইয়া 'যে আজ্ঞে' বলিয়াই সোজা নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যায় শম্ভু সরকার আপনার জীর্ণ তক্তপোষখানার উপর বসিয়া দূরে কাছারির বারান্দায় যেখানে রতন তাহার নূতন মাষ্টারের নিকট হইতে ইংরাজী বর্ণমালার পাঠ লইতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া ছিলেন। রতন বার-বার মুখ তুলিয়া সরকার মহাশয়ের ঘরের দিকে চাহিতেছিল আর সরকার মহাশয়ের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল। অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া শেষে কি ভাবিয়া শম্ভু সরকার উঠিয়া গেলেন।

বড়বাবু বাগানে পায়চারী করিতেছিলেন, শম্ভু সরকার

আসিয়া যুক্তকরে কহিলেন, "বাবু আমাকে বিদায় দিন।" আরও দুই-একটি কথাও বলিতে যাইতে ছিলেন কিন্তু গলার স্বর সহসা অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল, ভালো করিয়া আওয়াজ বাহির হইল না।

বড়বাবু সহজভাবেই কহিলেন, "যেতে চাইছেন? কোথায় যাবেন?"

"যে দিকে দুচক্ষু যায়, আর ক'টা দিনই বা? একরকম কেটেই যাবে" শম্ভু সরকার কহিলেন।

"তা বেশ। সন্ধ্যার পর কথা হবে।" শম্ভু সরকার তখনকার মত ফিরিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রহর-খানেকের সময় সরকার মহশেয়ের ডাক পড়িল। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বিশেষ দুঃখ বোধ করিতেছেন, এই প্রকারের গুটিকয়েক মামুলী কথা বলিয়া দশখানি দশ টাকার নোট শম্ভু সরকারের হাতে দিয়া বড়বাবু কহিলেন, "আপনার পারিশ্রমিক যৎকিঞ্চিত দিলাম।" নোট কয়খানি হাত পাতিয়া লইতে তাঁহার হাত কাঁপিয়া গেল। কোনক্রমে আত্মসম্বরণ করিয়া নোট কয়খানি ছেঁড়া জামার পকেটে ফেলিয়া শম্ভু সরকার বাবুকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "কাল ভোরেই বেরোব। একবার রতনকে দেখে যাব।"

বড়বাবু কহিলেন, "সে তো ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণ বুঝি।" সরকার মহাশয় তাড়াতাড়ি কহিলেন, "ঘুমুচ্ছে? আহা! তবে থাক। সারাদিন তো বিশ্রাম নেই।"

রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই শম্ভু সরকার তাঁহার সেই পুরাতন ব্যাগের হাতলে ছেঁড়া গামছা জড়াইয়া ছাতির ডগায় ঝুলাইয়া বাহির হইলেন। পথে উঠিয়া একবার পিছন ফিরিয়া দোতলায় রতনের রুদ্ধ-বাতায়ন শয়নকক্ষের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "মায়া! মায়া! পরের ছেলে!" তাহার পরক্ষণেই দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিলেন। অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘপথে আজ নূতন করিয়া শম্ভূ সরকারের যাত্রা আরম্ভ হইল।

মাস খানেক পর একদিন বড়বাবুর সম্মুখে বসিয়া রতন বিনোদ মাষ্টারের নিকট অধীত বিদ্যার পরীক্ষা দিতেছিল সেই সময় পিয়ন রতনের এক পার্শেল আনিয়া উপস্থিত করিল। বড়বাবু কৌতূহলী হইয়া পার্শেল খুলিলেন। মধ্যে প্রায় একশ' টাকা দামের একটি সোনার ঘড়ি আর একটুক্‌রা কাগজে লেখা 'বাবা রতনের জন্য।' প্রেরক শ্রীশম্ভুনাথ সরকার। কোন ঠিকানা নাই।

অনেকক্ষণ ঘড়িটীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া রতনের হাতে ঘড়িটী দিয়া বড়বাবু নীরবে বসিয়া রহিলেন। হঠাৎ তাঁহার চোখে ছবির মত ভাসিয়া উঠিল একদিনের কথা—বুড়া শম্ভু সরকার বাহিরের আঙ্গিনায় হামাগুড়ি দিয়া ঘোড়া হইয়া ছুটিতেছেন, আর রতন তাঁহার পিঠে সওয়ার হইয়া বসিয়া আছে

বছিরের দরগা

এর একটু ইতিহাস আছে।

বিশু জন্মিয়াছিল বাগ্দীর ঘরে। কিন্তু তার মা ও পাড়া-প্রতিবেশী সকলেরই নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, সে ছিল পূর্ব্ব জন্মে ব্রাহ্মণ, কোন পাপে বাগ্দীর ঘরে আসিয়া এবারে জন্ম লইয়াছে। এই ধারণার কারণও ছিল, পাঁচ বৎসরে পড়িয়াই বিশু একদিন বলিল, "আমি মাছ খাব না।" মা প্রথমে প্রহারের চোটে তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বিশু টলিল না। অগত্যা মাকেও এই জেদী ছেলের জন্য নিজের পরমপ্রিয় খাদ্য মৎস্য ত্যাগ করিতে হইল। আরও একটু বড় হইলে বিশু জেলে-বাড়ী হইতে একটা ছোট ঢোলক জোগাড় করিয়া সেটাকে গলায় ঝুলাইয়া পাড়ায় পাড়ায় "জয় রাধা গোবিন্দ" "ভজ গৌরাঙ্গ" গাহিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। মা বিরক্ত হইল; বিশুর সমবয়সী কেষ্ট ঘোষাল-বাড়ী গরু চরাইয়া মাসে নগদ এক টাকা উপার্জ্জন করে, অথচ তার ছেলে মায়ের দুঃখ বোঝে না। কিন্তু কিছু বলিবার উপায় নাই! ভগবানের নাম কীর্ত্তন—তাহাতে বাধা দিলে মহাপাপ! কাজেই নিরুপদ্রবে বালক বিশ্বনাথ প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় বাড়ী বাড়ী হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ইহার পর বিশু যে কাজে হাত দিল, তাহাতে সে যে পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিল এই সত্য নিঃশংসয়ে প্রমাণিত হইয়া গেল। এমন কি পাঠশালার পণ্ডিত তারণ চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত বলিয়া গেলেন, "দেখো বাগ্দী-বৌ, এই জলজীয়ন্ত বামুনের কথা। তোমার ছেলে ম'রে আবার বামুন হবে।"

মা কাণে হাত দিয়া কহিল, "ষাট্ ষাট্!" ব্যাপার এই। বিশু রথ দেখিতে ভিন্‌গাঁয়ে গিয়া এক নূতন বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণের কাজ দেখিয়া আসিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে মাথায় তাহার খেয়াল গজাইয়া উঠিল। বাড়ী আসিয়া মাকে কহিল, "আমি হরিমন্দির গড়ব তুই পয়সা দে।" মন্দির গড়িতে কতটা পয়সার দরকার তাহা হাতে গণিয়া ও কুড়ি হিসাবে বিশুকে বুঝাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বিরক্ত হইয়া বিশুর মা বিড়াল তাড়াইবার লাঠি দিয়া বিশুর পিঠে দু'ঘা বসাইয়া দিল।

ইহাতেও বিশুর সংকল্প টলিল না। ভোর না হইতেই সে একটা ঝাঁকা মাথায় করিয়া গ্রামের বাহিরের ভাঙ্গা শিবমন্দির হইতে সুরকী সংগ্রহ আরম্ভ করিল। দেব-স্থানের মাটি পায়ে লাগিবে বলিয়া মা প্রথমে তাহাকে যথেষ্ট ভৎ‌র্সনা করিল; অবশেষে প্রহার। বিশু চড়-চাপড় বিনা বাক্যবয়ে গ্রহণ করিয়া পুনরায় স্বকার্য্যে মন দিল। এইবার বিশুর মা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শরণ লইল; তিনি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়া দিলেন, "খুব সাবধান বাগ্দী-বৌ, ভগবান ওকে দিয়ে তাঁর কাজ করাচ্ছেন।

বাগ্‌ড়া দিস্‌নে।" ইহার পর বিশুর মা আর পুত্রের সঙ্কল্পে বাধা দিল না।

(২)

সুরকী আনিল। কিন্তু বিশুর কল্পনা যতখানি উঁচু ছিল, সুরকীর দেয়াল তত উঁচু হইয়া উঠিল না! মাটি, কাদা, তুষ ও সুরকীর অপূর্ব্ব মিশ্রণে দেয়াল উঠিল দুই হাত। বিশুর মুখখানি ছোট হইয়া গেল। কলসগাঁয়ের মন্দিরের মত হইল না তো! রাত্রে বিশু মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "অমনি একটা মন্দির গ'ড়ে দে মা।" মা পুত্রকে ভরসা দিয়া বলিল, "ছোট জাতের ছোট মন্দিরই ভালোরে বিশু। ডাকলে ঠাকুর এখানে আসবেন।"

পরদিন বিশু প্রাণপণে ঠাকুরকে তাহার ঢোলকের বাজনার সঙ্গে আহ্বান আরম্ভ করিল। ঠাকুর আসিলেন কিনা জানি না কিন্তু পাড়ার মাতব্বর বৃন্দাবন ঠাকুর আসিয়া জানাইয়া গেলেন যে, দিন-রাত ঢোলক বাজাইলে তিনি বিশুর কাণ ধরিয়া চৌকীদারের নিকট লইয়া যাইবেন। চৌকীদারের ভয়ে মা বিশুর ঢোলক কাড়িয়া লইল। অগত্যা বিশু কোথা হইতে ছোট একটি আঙ্গুরের বাক্স কুড়াইয়া আনিয়া তাহাতেই তাল দিয়া ঢোলকের কাজ চালাইতে লাগিল আর মনে মনে কেবলই ঠাকুরকে তাহার ছোট মন্দিরটিতে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিল।

বছিরের দরগা

সেদিন পূর্ণিমা। বৃন্দাঠাকুরের বাড়িতে রাস-মহোৎসব উপলক্ষে ঠাকুর আসিয়াছেন, সমস্ত দিন বিশু গান গাহিল, "একবার এস এস হে!" সন্ধ্যাকালে ঘণ্টাখানেক ঠাকুরবাড়ীর পুরোহিতের ভঙ্গীতে বসিয়া ঠাকুরকে তার ছোট মন্দিরে আনিবার জন্য অনেক মিনতি করিয়া বলিয়া দিল এবং রাত্রে যে ঠাকুর আসিবেন তাহাতে আর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় রাখিতে পারিল না। কারণ পূর্ণিমার রাত্রেই ঠাকুর আসেন, এ কথাটি তাকে বলিয়াছিল তার মা।

মা বাতাসী তখন নাসিকাধ্বনি সহকারে ঘুমাইতেছিল, বিশু ঠাকুরের আগমনের প্রতীক্ষায় ঘুমাইতে পারে নাই। উৎসব-বাড়ীতে যখন কীর্ত্তনের প্রারম্ভিক মৃদঙ্গধ্বনি উঠিল, তখন বিশু অতি সন্তর্পণে উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। পদশব্দ শুনিয়া পাছে ঠাকুর পলায়ন করেন এই ভয়ে হামাগুড়ি দিয়া তাহার মন্দিরে উঁকি দিয়া দেখিল—মন্দির শূন্য। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়া সে শয্যা লইল এবং সকালে মাকে জানাইল যে, ছোট মন্দিরে ঠাকুর আসিতে পারেন না, কাজেই তাহাকে বড় মন্দির গড়িতেই হইবে। বড় মন্দির গড়িতে হইলে যে পদার্থ-টির সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তাহাও বিশু শুনিল এবং সেই বস্তুটী সংগ্রহ করিবার জন্য পরদিন বারো বছরের ছেলে বিশু মাসিক তিন টাকা মাহিনায় কলসগাঁয়ের বাবুর বাড়ীর বাগানের কাজে ভর্ত্তি হইয়া গেল। কিন্তু এক ক্রোশ দূরে থাকিয়াও বিশু তাহার

মন্দিরের কথা ভুলিল না। প্রতি শনিবার ছিল তাহার ছুটি—সেদিন সে আসিয়া মন্দিরে দীপমালা দিয়া পাঁচ পয়সার বাতাসার লোভ দেখাইয়া পাড়ার বাগ্দী ছেলেগুলিকে জড় করিত। মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বিচিত্র বাদ্যধ্বনি ও নামগানের শব্দে পাড়ার লোকের কাহারো চোখে নিদ্রা আসিত না।

(৩)

বছর তিনেক এইভাবে কাটিল। বিশ্বনাথের মনিব বৃদ্ধ বয়সে বৃন্দাবন-বাস করিতে গ্রাম ত্যাগ করিলেন, বিশুও বিদায় লইল। বিশুর সংকল্পের কথা শুনিয়া তাহার মাহিনা চুকাইয়া আরো একটা মোটা রকমের দান তাহার সহিত যোগ করিয়া বাবু তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। বিশু মন্দির-নির্ম্মাণের পুঁজি লইয়া গ্রামে ফিরিল।

অনতিকাল মধ্যে ইঁট-সুরকীতে বিশুর প্রাঙ্গণ ভরিয়া গেল। গ্রামের লোক প্রথমে এতটুকু সন্দেহ করে নাই, কিন্তু যখন বিশুর মা'র মুখে আসল উদ্দেশ্যটি প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন গ্রামের ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। বাগ্দীর ছেলে মন্দির গড়িতেছে! শাস্ত্র-ধর্ম্ম সব রসাতলে গেল! দুই একজন বিশুর মাকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। বাতাসী ব্রহ্মশাপের ভয়ে বিবর্ণ মুখে গৃহে ফিরিয়া বিশুর কাছে কাঁদিয়া পড়িল। বিশু কহিল, "কিছু হবে না। আমি কালই পণ্ডিত

মহাশয়ের পাঁতি নিয়ে আসব। পণ্ডিত মহাশয় কলস গ্রামের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, সে অঞ্চলে তাঁহার বিধানই প্রামাণ্য ছিল।

কিন্তু বিশুকে আর পাঁতি আনিতে হইল না, সেই রাত্রেই বাতাসী কলেরার আক্রমণে ও ব্রহ্মশাপের ভয়ে ইহলোক ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। ভদ্র-সজ্জনেরা কহিলেন—"শাস্ত্র না মানলে এমনি হয়। ঘোর কলি এখনও হয়নি তো।"

মা'র মৃত্যুর পর বিশু দিন-দুই খুব কাহিল রহিল। তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে তার দলবল লইয়া মন্দিরের কাজে লাগিয়া গেল। বৃন্দাঠাকুর ছিলেন গ্রামের মাতব্বর, তার উপর বিশুর বাড়ী ছিল তাঁরই বাড়ীর পাশে; বিশুর কীর্ত্তন, সঙ্গীদের হরিধ্বনি, মৃদঙ্গ-করতালের শব্দ তাঁহারই নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইত বেশী। ইহার পর বিশুর মন্দির উঠিলে তাঁহার বিগ্রহের প্রণামী কমিয়া যাইবারও ভয় ছিল, কাজেই এই বাগ্দী ছোঁড়ার উপর তিনি জাতক্রোধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিশু তখন বড় হইয়াছে—কাহারও ভ্রূকুটি সে গ্রাহ্য করিল না।

(৪)

মন্দির যখন অর্দ্ধেক দূর উঠিয়াছে, তখন এক ঘটনায় গ্রাম তোলপাড় হইয়া উঠিল। রহিম মিস্ত্রীর স্ত্রীর পূর্ব্ব স্বামীর এক কন্যা ছিল। তার বিবাহ হইয়াছিল দূর গ্রামের এক কৃষকের সঙ্গে। সে প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। এক

মাস স্বামীর ঘর করিবার পর সে তাহাকে 'তালাক' দিয়া বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিল। রহিম তাহাতে মোটেই দুঃখিত হইল না, তাহার মিস্ত্রির কাজে একজন আপনার লোক জোগানদারের প্রয়োজন ছিল। আমিনা রহিমের সহিত বিশ্বনাথের মন্দিরের কাজ করিত। হঠাৎ কেমন করিয়া এই মেয়েটিকে বিশুর বড় ভালো লাগিয়া গেল। আমিনাও এই মিষ্টভাষী সুঠাম বাগ্দী যুবাকে ভালো না বাসিয়া থাকিতে পারিল না। তার কৈশোরে তখন যৌবনের রং ধরিয়াছে। মনে ক্ষুধাও ছিল বিস্তর। কোন কিছু বিচার না করিয়াই এই নবীন প্রণয়ী-যুগল প্রেমের দান-প্রতিদান আরম্ভ করিল। একজন বাগ্দী আর একজন সেখ, এ বোধ উভয়ের কাহারও ছিল না। কিন্তু বাগ্দী-পাড়ার যে দুই-একটি রমণীর এ সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য ছিল, তারা এই ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিল এবং সেখের বেটীর সহিত বিশুর এই অসঙ্গত ঘনিষ্টতায় ধিক্কার দিল।

বাহিরের লোক কিছুই জানিত না, কাজেই কিশোর-কিশোরীর এই প্রেম-লীলা অব্যাহত চলিতে লাগিল।

একদিন অপরাহ্নে বাবুর বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বিশুর ডাক পড়িল। বিশু আসিল; গ্রামের বাবুরা চণ্ডীমণ্ডপ দখল করিয়া বসিয়াছিলেন; পাঁচ সাতটা কলিকায় যুগপৎ তামাক পুড়িতেছিল। গিদ্দা বালিশ হেলান দিয়া বৃন্দাঠাকুর, লালন

চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মাতব্বরেরা বসিয়াছিলেন; মণ্ডপের প্রাঙ্গণে যুক্তকরে আমিনার মাতা, তার পশ্চাতে জনকয়েক তারই প্রতিবেশী; আর এক কোণে দাঁড়াইয়া আমিনা মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতেছিল। এই বৈঠক আর সেই সঙ্গে আমিনার মাকে দেখিয়া বিশুর বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল! সে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাঠাকুর কহিলেন, "কেষ্টঠাকুর এসেছেন! বেটা ছোট জাতের আস্পর্দ্ধা ছাখো না। মন্দির গড়বে না! বেটার পেট-পোরা সয়তানী মৎলব!"

"সেখের বেটী, তোর নালিশ?" আমিনার মা দশ মিনিট ধরিয়া নানা কথা কহিয়া গেল। বিশু তার মেয়ের ইজ্জৎ নষ্ট করিয়াছে, সে বিচার চায়!

বিশুর মাথা ঘুরিতেছিল, আমিনা শেষে তাহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে, এই চিন্তা তার সমস্ত মনকে বিষাক্ত করিয়া দিয়াছিল, বিশু কথা কহিল না। আমিনা এতটা মনে করে নাই। মা'র মনে অনেক দিন হইতেই সন্দেহ ছিল। কিন্তু সে কিছু দেখিয়াও দেখে নাই। কাল সন্ধ্যায় যখন কাণাঘুষায় কথাটি শুনিয়া বৃন্দাঠাকুর তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তখন সে তার সন্দেহের কথা তাঁকে জানাইল। তারপর তাঁহারই পরামর্শ মত আমিনাকে প্রশ্ন করিয়া সকল সংবাদ জানিয়া লইল। আমিনা এতখানি ঘটিবে তাহা ভাবে নাই, অকপটে মা'র কাছে সমস্তই বলিয়াছিল। তারপর আজ দ্বিপ্রহরে যখন

স্বয়ং বৃন্দাঠাকুর তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমিনার মা'র সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া গেলেন, তখন অন্তরাল হইতে শুনিয়া ভয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া গেল। বাবুর বাড়ীতে আসিতেও সে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু মা তাকে প্রহার করিয়া লইয়া আসিয়াছে। সে আমিনাকে হাজির করিবার 'জবান' দিয়াছে, তা' ছাড়া বৃন্দাঠাকুরের দেওয়া অগ্রিম দশ টাকার নোট তখনও অঞ্চলে বাঁধা ছিল, নেমকহারামী সে কি করিয়া করিবে ?

মা'র অভিযোগ শেষ হইলে বিশু তীব্র অথচ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমিনার দিকে চাহিল, তখন সে আরো বেশী করিয়া কাঁদিতে লাগিল। চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বিশুকে জবাবদিহি করিবার আদেশ হইল, বিশু তবুও কথা কহিল না। তখন ছোটলোকের দুষ্কার্য্যের জন্য যে শাস্তির বিধান আছে, বিশুর প্রতি তাহাই প্রযুক্ত হইল। লালন চক্রবর্ত্তীর নির্দ্দেশ মত তাঁহার পাইক ফেকু সর্দ্দার বিশুর কাণ ধরিয়া সমস্ত উঠান ঘুরাইতে লাগিল, বিশু আপত্তি করিল না। কিন্তু আমিনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একেবারে ফেকু সর্দ্দারের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল, "মামুজী, মাপ কর! মাপ্!"

চণ্ডীমণ্ডপ শুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল।

কর্ণমর্দ্দন-পর্ব্ব শেষ হইলে বৃন্দাঠাকুর কহিলেন, "তা যেন হলো! তারপর এ মেয়েকে বিয়ে করবে কে ? কি বল চৌধুরী,

'সেখের বেটী যে ইজ্জৎ হানির নালিশ করেছে, তার কি করবে ?"

চৌধুরী চুপি চুপি কহিলেন, "দু'-দশ টাকা দিয়ে বিশে বিদেয় ক'রে দিক !"

বৃন্দাঠাকুর কহিলেন,"আরে বল কি,জাত-মারা কাণ্ড! দু'-দশ টাকা ! দু'-দশ টাকায় জাত ফিরবে ?" তারপর আমিনার মাতাকে কহিলেন, "কি গো সেখের বেটী, দু'-দশ টাকা খেসারত নেবে ?"

পূর্ব্ব শিক্ষামত আমিনার মা কাঁদিয়া কহিল, "টাকায় কি ইজ্জৎ ফিরবে বাবু ? আমার মেয়ে নিয়ে কে ঘর করবে ? বাগ্দীর পো আমার বেটীকে 'নিকা' করুক !" এত বড় সৎযুক্তিটা এতক্ষণ সমাজপতিদের মাথায় খেলে নাই দেখিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইলেন। বৃন্দাঠাকুর কহিলেন, "আমরা যখন আছি গাঁয়ের মাথা, তখন বিচার করতেই হবে,—কি বল চৌধুরী ? সেখের বেটী যা বলে।"

আমিনার মাতার পশ্চাৎ হইতে গুটি-কয়েক কণ্ঠ সমস্বরে কহিল, "হাঁ বাবুজী, ঠিক হবে বিচার !"

তখন চণ্ডীমণ্ডপ হইতে আদেশ জারি হইল বিশুকে কলেমা পড়িয়া আমিনাকে বিবাহ করিতে হইবে।

কলেমা পড়িবার কথা শুনিয়া বিশু কাঁপিয়া উঠিল। সমস্ত পৃথিবীটা তার চোখের সম্মুখ হইতে মুহূর্ত্তে অপসৃত হইয়া গেল। বিশু সংজ্ঞা হারাইল। কিন্তু বাবুদের পঞ্চায়েতের বিচারের নড়চড় হইবার যো নাই। অচেতন বিশুকে লইয়া যাইবার হুকুম পাইয়া

আমিনার মা'র প্রতিবেশীরা "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি তুলিল। চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বৃন্দাঠাকুর কহিলেন, "যা বেটারা, নিয়ে যা, এখানে আর গোল করিস নে।"

বিশুর চেতনা হইয়াছিল অনেক পূর্ব্বেই; কিন্তু আপনার অবস্থা সম্পূর্ণ বুঝিবার মত জ্ঞান হইল এক প্রহর রাত্রে। দেখিল যে, আমিনার মাতার কুটীরে সে বসিয়া আছে, তার পাশে বসিয়া আমিনা তাকে পাখার বাতাস করিতেছে। মাথার উপর একটা ভারী পদার্থের অস্তিত্ব সে বোধ করিতেছিল—তুলিয়া দেখিল সেটা একটা টুপী। মুহূর্ত্তের মধ্যে টুপীটা ফেলিয়া দারুণ অন্তর্দ্দাহের আবেগে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কোন দিকে না চাহিয়া একেবারে সোজা চলিয়া গেল।

(৫)

তার পর?

পরের কথা অতি অল্প। সমস্ত রাত্রি পাড়ার লোক শুনিল, বিশু তারস্বরে সুর করিয়া ডাকিতেছে "জয় রাধে গোবিন্দ", তার সমস্ত দেহ-মন যেন এই সুরের রূপ ধরিয়া অপ্রত্যক্ষ দেবলোকে কোন্ অভীষ্ট দেবের সন্ধান করিতেছিল! সুরের বিরাম নাই। রাত্রি তিন প্রহর হইয়া গেল—গান থামিল না। ভোরের সময় একটা ভীষণ শব্দ হইল, সেই সঙ্গে গানের সুর থামিল। পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিল।

নিজের হাতে শাবল দিয়া খুঁড়িয়া মন্দিরের দেয়াল ফেলিয়া তাহারই নীচে বিশু আপনার সমাধি রচনা করিয়াছে। বাহির হইতে দেখা যাইতেছিল শুধু তার রক্তাক্ত সুদীর্ঘ কেশের গুচ্ছ।

গ্রামের ভদ্রলোকেরা আসিয়া ব্যবস্থা দিলেন, ভাঙ্গা দেয়ালের উপর মাটি চাপা দিয়া বিশুর কবর দেওয়া হোক। ওই মাটীর ঢিবিটা তাই!

মসজিদে বিশুর নাম হইয়াছিল বছির, তাই ইহার নাম হইয়াছে 'বছিরের দরগা'।

আমিনা?

এই ঘটনার পরদিন বিশুর কবরের উপর শাবল দিয়া আপনার মাথা ভাঙ্গিয়া সেও মরিয়াছে। সে নাকি মৃত্যুর পূর্ব্বে পাগল হইয়া গিয়াছিল।

গিরিবালার জীবন-পঞ্জী

গিরিবালাকে জানিতাম। গ্রামের নদীটির বাঁকের মুখে বেত-ঝোপের ছায়ার অন্ধকার আশ্রয় করিয়া ছুটির সময় যখন সন্ধ্যাকালে বোয়াল মাছের সন্ধানে ছিপ ফেলিয়া বসিতাম, তখন সে ঘাটে প্রদীপ ভাসাইতে আসিত। একখানি গোল মুখ, টীকল নাক, তাহাতে একটি ছোট নোলক—নিতাই জেলের আট বছরের মেয়ে—নাম গিরিবালা, প্রতি সন্ধ্যায় সে নদীর স্রোতে ভাগ্যের প্রদীপ ভাসাইয়া মাটীর ছোট কলসীতে জল ভরিয়া মৃদুস্বরে 'বন্দ মাতা সুরধনী' গাহিতে গাহিতে ঘরে ফিরিয়া যায়; —গিরিবালার বাল্য-জীবনের এই বৈচিত্র্যবিহীন ইতিহাসটুকুই অমার জানা ছিল।

ইহার পর যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। দশ বৎসর যখন বয়স—তখন গিরিবালার বিবাহ হইল এবং সেই বৎসরেই পিতা নিতাই ও স্বামী সদানন্দ পদ্মায় মাছ ধরিতে গিয়া আর ফিরিল না। মায়ের সঙ্গে গিরিবালাও কাঁদিল। তাহার পর নিতাই মাঝির জাল শুকাইবার চালাখানিতে ঢেঁকি পাতিয়া মাতা ও পুত্রী পাড়ার লোকের ধান ভানিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

(২)

বৎসর চার-পাঁচ পর একদিন রায়বাবুদের আঙ্গিনায় আছড়াইয়া পড়িয়া গিরিবালার মাতা কাঁদিয়া জানাইল যে, আজ একমাস হইতে রাত্রিতে তাহার ঘুম নাই। সমস্ত রাত্রি তাহার বাড়ীর চারিপাশে লোকের পায়ের শব্দ শোনা যায়, ভয়ে তাহার গা ছম্-ছম্ করিতে থাকে। তিনপুরুষ আগে রায়বাবুরা ছিলেন গ্রামের জমিদার; জমিদারী এখন বাস্তুভিটার সাড়ে সাত বিঘা জমিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। দেউড়ী এখনও আছে কিন্তু দারোয়ান নাই। তথাপি এখনও বদন রায় মহাশয়কে অনেক অভিযোগ শুনিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বেও বিচার করিয়া জরিমানা ও নজর বাবদ কিছু প্রাপ্তি ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ফজল মিঞা বাঁশচিটা ইউনিয়ানের প্রেসিডেণ্ট হওয়াতে প্রাপ্তির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কাজেই এখন বিচার না করিয়া রায়বাবু শুধু পরামর্শ দিয়া থাকেন। দারোগাকে সকল কথা জানাইবার উপদেশ দিয়া তিনি বুড়ি মানদাকে বিদায় করিয়া দিলেন, দরকার হইলে তাহার পক্ষ হইয়া দারোগাকে দুই কথা বলিবেন, এ ভরসা দিতেও ত্রুটি করিলেন না।

এইবার মানদা বিপদে পড়িয়া গেল। দারোগা হাকিম। তাঁহার সহিত কি করিয়া কথা বলা যায়? অনেক ভাবিয়া একদিন সে এক কাঠা সরু ধানের চিঁড়া লইয়া গ্রামের চৌকীদার নছর

সেখের শরণ লইল। উপঢৌকন পাইয়া খুসী হইয়া নছর সেখ দিনকেয়েক রোঁদ হইতে ফিরিবার পথে নিতাই মাঝির বাড়ীর নিকটে হাঁক দিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাতেও গিরিবালার মাতার আস্বস্তির কারণ ঘুচিল না। অবশেষে বিনা পারিশ্রমিকে নছর সেখের ধান ভানিয়া ও গাছের মর্ত্তমান কলা উপহার দিয়া বুড়ি একদিন তাহাকে দারোগার নিকট লইয়া যাইতে নছর সেথকে রাজী করিল।

সুযোগও ঘটিয়া গেল। পাশের গ্রামেই দারোগা সাহেব তদন্তে আসিয়াছিলেন। নছর সেখকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কালী-গাইয়ের এক ঘটি দুধ হাতে বুড়ি গিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সম্মুখে আসামী ও ফরিয়াদী পক্ষের অনেকগুলি সাক্ষী যুক্তকরে দণ্ডায়মান; তাহাদের সম্মুখে সগুগঠিত ছোট বংশমঞ্চে দারোগা সাহেব বসিয়া, মঞ্চের সম্মুখ দিককার একটা খুঁটিতে বাঁধা একজোড়া মুরগী, পিছনের খুঁটিতে বিরাট কৃষ্ণকায় এক খাসী বাঁধা। গম্ভীর মুখে দারোগা সাহেব লিখিতেছিলেন। মুরগী ও খাসীর সহিত এক ঘটি দুধের তুলনা করিয়া বুড়ী মনে মনে শঙ্কিত হইল; পরক্ষণেই নছর সেখের ইঙ্গিত মাত্রে দারোগা সাহেবের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপাতের সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী আপনার বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিল।

দারোগা সাহেব অর্দ্ধেক শুনিয়াই কহিলেন, "মেয়ের বয়স কত?"

"এই ষোল বছর হুজুর ! সোমত্ত—"

"এখন যাও। সরেজমিন তদন্ত করব। হ্যাঁ, তারপর আসামীর তুই নম্বর সাক্ষী বাঁটু দপ্তরী।"

বাঁটু দপ্তরী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। নছর বুড়ীকে লইয়া গিয়া কানে কানে কহিল, "সাঁঝে বাড়ী থেকো জেলের বেটী, দারোগা সাহেব যাবেন।"

বুড়ী অকূলে কূল পাইয়া মা মনসার নামে পাঁচ পয়সার বাতাসা মানৎ করিয়া ঘরে ফিরিল। মায়ের মুখে সমস্ত শুনিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে গিরিবালা খানিক কাঁদিল। তাহার পর বেড়ায় টাঙ্গানো সত্যনারায়ণের ছবিখানির সম্মুখে গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া কহিল, "লজ্জা-নিবারণ হরি ! লজ্জা নিবারণ কর, ঠাকুর !"

তখন সন্ধ্যা। তুলসী-তলায় প্রদীপ দিয়া গললগ্ন বস্ত্রাঞ্চলে বার-বার মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া গিরিবালা সম্ভবতঃ কোনো প্রার্থনা জানাইতেছিল, এমন সময় দারোগা সাহেব আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন। জুতার শব্দে মুখ ফিরাইয়া দারোগাকে দেখিয়া গিরিবালা মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘরের পিছনে অদৃশ্য হইয়া গেল। মানদা রান্নাঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া দাওয়ায় একখানি মাদুর বিছাইয়া দিল। দারোগা সাহেব আসন লইয়া সমস্ত শুনিয়া গিরিবালাকে ডাকিলেন। পরণের ছোট কাপড়খানির চারিদিক সামলাইতে সামলাইতে সঙ্কুচিতা গিরিবালা আসিয়া দাঁড়াইল। তুই চক্ষুর সমস্ত শক্তিকে একত্র করিয়া সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকেও

দারোগা সাহেব ভালো করিয়া গিরিবালাকে দেখিয়া লইলেন। মেয়েটি দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে। তখন তাহার মনের গতিটা কোন্ দিকে বুঝিবার জন্য দুই-একটি প্রশ্ন করিতেই লজ্জায় মরিয়া গিরি একেবারে ঘরের অন্ধকার বেড়ায় গিয়া মুখ লুকাইল। মানদা ক্রমাগত ঘরের মধ্য হইতে ঠেলিতে লাগিল, কিন্তু কোনোক্রমেই কন্যাকে বাহিরে পাঠাইতে পারিল না।

অগত্যা কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দারোগা সাহেব উঠিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সন্ধান লইবেন—মৃদু হাসিয়া এই প্রতিশ্রুতিটা দিয়া গেলেন। দারোগা চলিয়া গেলে বাহির হইতে নছর চৌকীদার আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া কহিল, "বেঁচে গেলে জেলে-বৌ, হাকিম তোমার সহায় হ'য়েছেন।"

বুড়ী নিশ্চিন্ত হইয়া দুই কর কপালে ঠেকাইয়া দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল, কিন্তু গিরি সেদিন আর শয্যা ছাড়িয়া উঠিল না।

(৩)

ইহার পর দিনকয়েক নানা স্থানে তদন্তে যাইবার পথে দারোগা সাহেব প্রতিশ্রুতি মত বুড়ী ও তাহার কন্যার সন্ধান লইতে আসিলেন। কিন্তু সন্ধানের মুখ্য বস্তুটি ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাইলেই ঘরের পিছনের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়া যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত, তাহা মানদাও আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিত না। কন্যার এই অকৃতজ্ঞতায় বুড়ী লজ্জিত হইত ও

কন্যার পক্ষ হইতে হাকিমের কাছে ক্ষমা চাহিয়া, তাঁহার জন্য প্রতিবারই ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিত। বলা বাহুল্য, এই একঘেয়ে নীরস ক্ষমাভিক্ষা দারোগা সাহেবের বেশী দিন ভালো লাগিল না এবং বাঁশচিটার হাটের পথে তাঁহার গতিবিধি ক্রমে ক্রমে বিরল হইয়া আসিল।

ইহাতে অবশ্য গিরিবালার অবস্থার কোনো ইতর-বিশেষ হইল না ; জীবন-ধারা যেমন বহিতেছিল তেমনই বহিয়া যাইতে থাকিল। সমস্ত দিন নানা কাজের মধ্যে আপনার অবস্থার কথাটি বিশেষ মনে থাকিত না, কিন্তু সূর্য্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গেই জগতের দুর্ভাবনা আসিয়া জুটিত এবং পৃথিবীটাকে মনে হইত একটি জীবন্ত প্রেতপুরী। সহসা একদিন গিরিবালার সমস্ত দুর্ভাবনার সমাপ্তি হইল।

সেদিন শ্রাবণের বর্ষণ প্রভাত হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। বর্ষার রাত্রি। প্রথম প্রহরেই পল্লীর বুকে নিশীথের নিস্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গিরিবালার মাতার কুটীর-প্রাঙ্গণ হইতে সহসা এক আর্ত্ত চীৎকারধ্বনি উঠিল। শ্রাবণের বর্ষণ-রব ছাপাইয়া সে আর্ত্তনাদ সুখ-সুপ্ত ভদ্রপল্লীকে পর্য্যন্ত ধ্বনিত করিয়া তুলিল এবং পল্লীর নিদ্রার জড়তা টুটিবার পূর্ব্বেই ভরা নদীর তরঙ্গ-কল্লোলে ডুবিয়া গেল।

গ্রামে যে একেবারে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল না, তাহা নহে। ও-পারের ঝাউবনের অন্ধকারের অন্তরালে যখন গিরিবালাকে

বহিয়া পাল্সী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, তখন পথের মোড়ে নছর চৌকীদারের ভীম গর্জ্জন শোনা গেল! এদিকে গণেশ মাঝির মুখে সংবাদ পাইয়া হারু ঘোষাল আসিয়া রায়বাবুকে ডাকিয়া তুলিয়া কহিলেন, "যা ভেবেছিলাম রায়বাবু, তাই হ'ল, নিতাই মাঝির মেয়েকে নিয়ে গেল!" রায়বাবু চক্ষু মুছিয়া রাম-নাম জপিতে জপিতে বাহিরে আসিলেন। ক্রমে ক্রমে রায়-বাড়ীর বৈঠকখানায় গ্রামের ভদ্রসন্তানদের একটি ছোট সভা বসিয়া গেল। মাখন ভৌমিকের বয়স অল্প। সখের থিয়েটারে ক্রমাগত লক্ষ্মণের ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে বিপন্না স্ত্রীলোকের প্রতি তাহার একরকম মমত্ব-বোধ জন্মিয়াছিল, সভাস্থ একজন থানায় সংবাদ দিবার প্রস্তাব করিতেই সে কহিল, "থানায় খবর দেওয়া কিছু নয়। আমি যাচ্ছি, আপনারা আসুন!" হারু ঘোষাল ধমক দিয়া কহিলেন, "ওই কাজটি কোরো না বাবাজী! থিয়েটার করতে গিয়ে চিন্তে চাঁড়ালের পা' ধ'রে 'দাদা' 'দাদা' ব'লে চেঁচাও সেটা বরং সওয়া যায়, কিন্তু ছোট লোকের হাতে মার খেয়ে আর আমাদের মুখ হাসিও না।" ছোট লোকের হাতে মার খাওয়ার আশঙ্কায় অকস্মাৎ মাখন ভৌমিকের উৎসাহ দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল এবং অতঃপর থানায় সংবাদ দেওয়াই যে সর্ব্বাপেক্ষা সুযুক্তি সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ রহিল না।

গিরিবালার চরিত্র সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা সর্ব্বপ্রকার আলোচনা করিয়া যখন ক্রমে ক্রমে থামিয়া গেল, তখন একদিন হঠাৎ সংবাদ

আসিল যে, গিরিবালাকে বারখালির আমীর সেখের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। গ্রাম আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং যদিও হাট বার—তথাপি বাঁশচিটা ইউনিয়ানের প্রেসিডেণ্ট চামড়ার দালাল ফজল মিঞার বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনায় কৌতূহলী দর্শকের ভিড় জমিয়া গেল।

ক্ষান্তবর্ষণ শ্রাবণ-দিবসের রক্তসন্ধ্যা সমস্ত আকাশকে আরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সঙ্গী চৌকীদার দু'জনের কাঁধে হাত রাখিয়া টলিতে টলিতে গিরিবালা আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যর্থ অশ্রুপাতের চিহ্ন তখনও তাহার কপোলে শুকায় নাই, জাগরণরক্তিম নিষ্প্রভ চক্ষু দু'টি তখনও সন্ধ্যার রক্তদীপ্তিতে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। চারিপাশের চিরপরিচিত মূর্ত্তিগুলি গিরিবালা একবার দেখিয়া লইল কিন্তু সেকালের মত আজ আর মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল না। ক্ষণিকের জন্য গ্রামের লোকের মনে হইল এ যেন সে গিরিবালা নহে। এই সময় জনতার পিছন হইতে ছুটিয়া আসিয়া উন্মাদের মত কন্যার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মানদা চীৎকার করিয়া উঠিল, "তোর এ দশা কে করেছে গিরি!" উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে নিমেষ কালের জন্য মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া গিরিবালা অঙ্গুলি তুলিয়া আকাশের দিকে দেখাইয়া দিল, কথা কহিল না।

ফজল মিঞার হুকুমে আসামী আমীর সেখ হাজির হইল। ফজল মিঞাকে পায়ের নাগরা খুলিতে দেখিয়াই আমীর সেখ দুই হাত জুড়িয়া কহিয়া উঠিল, "হুজুর, ও আমার 'নেকার' বিবি।"

সহসা এই কথা শুনিয়া গিরিবালা শিহরিয়া উঠিল এবং সমস্ত দেহভার ফজল মিঞার পদতলে নিক্ষেপ করিয়া অস্ফুটস্বরে কি কহিল, তাহা বোঝা গেল না। তাহার মাথায় হাত দিয়া সংক্ষিপ্ত একটি আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করিয়া ফজল মিঞা আমীর সেখকে থানায় লইয়া যাইতে হুকুম দিলেন। থানা বহুদূরে, কাজেই সে রাত্রি ফজল মিঞার জিম্মায় গিরিবালাকে রাখিয়া মেম্বারেরা হাট করিতে চলিয়া গেলেন।

গভীর রাত্রে ফজল মিঞার গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান কাদের শুনিতে পাইল, কে যেন তাহার মনিবের বাহিরের কোঠা-ঘরে মিনতির স্বরে কহিতেছে, "আপনার পায়ে পড়ি হুজুর, আপনি আমার ধর্ম্মবাপ।" তাহার পরই মেঘগর্জ্জনের সাথে সাথে শ্রাবণ-রাত্রির ধারা নামিয়া আসিল, আর কিছু শোনা গেল না।

ইহার পর থানা। অভিযোগ দণ্ডবিধি আইনের অনেকগুলি ধারা ঘেঁসিয়া গিয়াছে; মামলা সঙ্গীন। আসামীর একরার লইতে হইবে। কাজেই গিরিবালাকেও একরাত্রি থানায় অপেক্ষা করিতে হইল। পরদিন প্রভাতে যখন চৌকিদারের সাথে সে গরুর গাড়ীতে গিয়া উঠিল, তখন থানার বারান্দায় চেয়ারে উপবিষ্ট দারোগা সাহেব এবং তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান শৃঙ্খলিত আমীর সেখ এই উভয়ের মধ্যে গিরিবালা কোনও প্রভেদ দেখিতে পাইল না।

(৪)

ইহার পর সাহেব ডাক্তার, লেডী ডাক্তার, পুলিশের বড় কর্ত্তা, উকীল, মোক্তার কয়েকদিন ধরিয়া তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বপ্নাবিষ্টের মত গিরিবালা তাহার উত্তর দিয়া গেল। কি বলিল তাহাও মনে রহিল না। কিন্তু কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া আসামী আমীর সেখ ও তাহার ছয়টি সহচরকে দেখাইয়া আপনার জীবনের কলঙ্কের প্রত্যেকটি কাহিনী সে অতি স্পষ্ট ভাষায় কহিয়া গেল, বলিতে কোথাও বাধিল না। গ্রাম হইতে যে দুই-একজন ভদ্রসন্তান মানদাকে লইয়া মামলা উপলক্ষে সহরে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নিতাই মাঝির কন্যার এই নির্লজ্জতায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

বিচার সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আদালতের বটতলায় মানদার গরুর গাড়ী গ্রামে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল, গিরিবালা ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে চলন্ত গাড়ীর চাকা ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল, "আমাকে ফেলে যাস্‌নি মা! নিয়ে চল্‌!"

ইহার উত্তরে গাড়ীর মধ্যে একজন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহাকে ধমক্ দিয়া হারু ঘোষাল গাড়ীর পর্দ্দা তুলিয়া দাঁত খিঁচাইয়া কহিলেন, "তা বটেই তো! বুড়ী তোমাকে নিয়ে এখন পরকাল খোয়াক্!"

গরুর গাড়ীর চাকা হইতে গিরিবালার শিথিল মুষ্টি খুলিয়া পড়িল, গাড়ী চলিয়া গেল।

৮

লোকের মুখে এই পর্য্যন্তই শুনিয়াছিলাম, ইহার পর বিচিত্র পুঁথির বিবিধ তথ্যের নীচে পুরাতন কাহিনীটা একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

আজ সহসা গিরিবালার কথা মনে হইবার হেতু আছে। কাল বদ্‌লী হইয়া আসিয়া প্রাতে প্রাথমিক পরিদর্শনের কাজে বাহির হইয়াছিলাম, এমন সময় কে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ছেড়ে দাও গো, ছেড়ে দাও! আমার দেশের মানুষ যাচ্ছে, ছেড়ে দাও!" মুখ ফিরাইয়া দেখি একটি রমণী পাগ্‌লা গারদের মোটা লোহার শিক্ দুই হাতে ধরিয়া টানিতেছে। নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম, চিনিতে বিলম্ব হইল না। মাটিতে জানু পাতিয়া বসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো আমার দেশের মানুষ, এমন কেন হ'ল?"

আমার ডাক্তারী বিদ্যায় আর এ প্রশ্নের উত্তর জুটিল না, নীরবে ফিরিয়া গেলাম।

দেশদ্রোহী

অমরেশ সসম্মানে বি-এ পাশ করিয়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে মাষ্টারী জুটাইয়া লইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এম-এ পরীক্ষার বই পড়া ও সন্ধ্যায় স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করা ছাড়া তাহার আর কোনও কাজ ছিল না।

স্বদেশ-প্রেমের বন্যায় তখন সহরের সরকারী স্কুল কলেজগুলি টল্‌মল্ করিতেছিল। একদিন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মিঃ দত্তকে ভগীরথ করিয়া এই বন্যা সহসা দশঘরা গ্রামে প্রবেশ করিল। মিঃ দত্তের নাম আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। সংবাদপত্রে তাঁহার অসাধারণ ত্যাগের কাহিনী সে প্রায় প্রত্যহই পড়িত। তাঁহার ত্যাগ ও চরিত্র অমরেশকে তাঁহার অনুরাগী করিয়াছিল। মিঃ দত্তের আগমনের বার্ত্তা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

সাহা বাবুদের বাগান-বাড়ীতে মিঃ দত্ত বিশ্রাম করিতেছেন। সম্মুখের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অগণ্য নরমুণ্ড। তাহাদের মধ্যে গান্ধী-টুপী মাথায় হলুদ-রংএর ব্যাজ পরিয়া স্বেচ্ছাসেবকের দল শান্তিরক্ষা করিতেছিল। অমরেশ পাশ কাটাইয়া যেখানে মিঃ দত্ত অনুরাগীগণ পরিবৃত হইয়া স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। একজন কহিয়া উঠিল, "এই যে অমরেশবাবু নিজেই এসেছেন!"

অমরেশ সে কথায় কাণ দিল না, সে মিঃ দত্তকে দেখিতে লাগিল। ত্যাগী কর্ম্মবীরের এই তো যোগ্য বেশ! খদ্দরের সংক্ষিপ্ত পরিধান আর একখানি মোটা চাদর; অবিন্যস্ত সুদীর্ঘ কেশরাশি। মিঃ দত্ত অমরেশের প্রশংসমান দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "বসুন, আপনার কথাই বলছিলাম। আপনাকে আমাদের চাই।"

অমরেশ আসন লইয়া কহিল, "আমি কি কাজে লাগতে পারি?"

"সমস্ত কাজে। আপনাকে আমি গুরুতর কাজের ভার দেব। আজ আপনারা যদি না আসেন, তবে এই হতভাগ্য অন্ধ দেশবাসীকে কে দৃষ্টি দেবে? এই অত্যাচার জর্জ্জর, বুভুক্ষু জীবন্মৃত মানুষগুলোর মধ্যে নবজীবন সঞ্চারের জন্য দেশমাতা আপনাদের ডাকছেন। আপনারা সাড়া দেবেন না?" তাহার পর জালিয়ানওয়ালাবাগের কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত দেশের যাবতীয় ঘটনা মিঃ দত্তের ভাষায় এমন করুণ হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল যে, অমরেশ অশ্রু ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারিল না। মিঃ দত্তের কথা শেষ হইলে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবেগ গদ্‌গদ স্বরে কহিল, "আমি সম্পূর্ণ ভাবে আজ আমাকে আপনার হাতে সমর্পণ কল্লাম। দেশের কল্যাণের জন্য আমার দ্বারা যা সম্ভব হ'তে পারে আপনি মনে করেন, আমি তা কর্ব্ব। আপনি শুধু আদেশ দেবেন।"

মিঃ দত্ত কহিলেন, "আমি তোমাকে দেশমাতৃকার নামে

গ্রহণ করলাম। একটা কথা আমি তোমাকে এইখানেই জানাচ্ছি —তোমার অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট হবে না। তবে আমার দেশ দরিদ্র, তোমার সেবা উপযুক্ত মূল্যে সে কিনতে পারবে না। তবে যতদূর সম্ভব হয়—"

অমরেশ বাধা দিয়া কহিল,—"আমার চিন্তা আমি করিনে। ঘরে মা আছেন, তাঁর প্রয়োজন স্বল্প ; তিনি যেন আমার জন্য কষ্ট না পান দেখবেন।"

মিঃ দত্ত কহিলেন, "তাঁকে দেখবার ভার আমার। চল বাইরে লোকজন অপেক্ষা কর্চ্ছে।"

মিঃ দত্ত সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পুরনারীরা লাজ ও পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিলেন। "বন্দেমাতরম্" শব্দে বৃহৎ দশঘরা গ্রামখানি ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

তাহার পর সর্ব্বসমক্ষে অমরেশকে আনিয়া দাঁড় করাইয়া স্বহস্তে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া মিঃ দত্ত তাহাকে স্থানীয় জনমণ্ডলীর নেতৃপদে অভিষিক্ত করিলেন। জনতা জয়ধ্বনি দিল।

এম-এ পরীক্ষার বইগুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া ও ডেপুটীগিরির নমিনেশনের চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অমরেশ সন্ধ্যায় স্বগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতা পূর্ব্বেই সংবাদ শুনিয়াছিলেন, অমরেশকে দেখিয়া কহিলেন, "তুই চাকরী ছেড়ে এলি অমর? সব ভেবে-চিন্তে দেখেছিস তো? বাপের কিছু দেনা-পত্তর আছে তাও তো জানিস?"

অমরেশ কহিল, "ভেবোনা মা, দেশমাতার আশীর্ব্বাদে সমস্ত মঙ্গল হবে। যে বিরাট ত্যাগের আদর্শ আজ দেখে এলাম, তা দেখে কি আর নিজের ক্ষুদ্র চিন্তা নিয়ে থাকা সম্ভব? তুমি আশীর্ব্বাদ কর।"

অমরেশ মাতার পদধূলি লইয়া মাথায় মাখিল।

* * * *

ইহার পর একদিন মাত্র আমি অমরেশকে দেখিয়াছি। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছিলাম। সন্ধ্যা হইতে কালবৈশাখীর ঝড় সুরু হইয়াছিল, রাত্রি দ্বিপ্রহর—তখনও ঝড় থামে নাই। বাহিরের ঘরে বিছানায় শুইয়া সেক্‌স্‌পিয়র পড়িতেছিলাম, সহসা ডাক শুনিলাম, "সতু বাড়িতে আছ?"

"কে?"

"আমি অমরেশ।"

অমরেশ এই দুর্যোগে! দরজা খুলিলাম। ভিতরে আসিয়া যে মনুষ্যমূর্ত্তি দাঁড়াইল, অতি পরিচিত ব্যক্তিও প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে অমরেশ বলিয়া চিনিতে পারিত না। তাহার চমৎকার বর্ণ তামাটে হইয়া গিয়াছে। মাথায় এক ঝাড় চুল; তাহা বাহিয়া তখনও জল পড়িতেছিল। গায়ে একটি ছিন্ন মলিন পিরাণ, তাহার হাতায় এক টুক্‌রা হলুদ-রংএর কাপড়ে লেখা "বন্দেমাতরম্"। পরণের কাপড়খানার নিম্নার্দ্ধ জল এবং কাদায়

মাথা। হাতে একগাছা লাঠী। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আমার চ'খে জল আসিতেছিল। অমরেশ আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "দুঃখ করোনা সতু! এই বিধাতার বিধান! কঠোর তপস্যা ছাড়া দেশের মুক্তির কোনো পথ নেই।"

বলিয়া অমরেশ মাটিতে বসিয়া পড়িল। আমি কহিলাম, "সব শুনছি, কাপড় ছাড় আগে।" "উঁহু! কাপড় ছাড়বার সময় নেই! দুটো খেতে দিতে পার কিনা দেখ।"

বৌদিদিকে ডাকিয়া তুলিয়া রান্নাঘরে যাহা অবশিষ্ট ছিল আনিয়া দিলাম। অমরেশ খাইতে বসিয়া বলিতে লাগিল, "আজ চার দিন খাইনি সতু! সতেরো তারিখে হোসেনগঞ্জের মিটিং ক'রে কামারদয় আসি। সেখান থেকে নৌখালি, তারপর আজ প্রাতে রওনা হ'য়ে এই তোমার এখানে —"

"সর্ব্বনাশ! নৌখালি থেকে বরাবর এখানে! চল্লিশ মাইল পথ!"

"কত মাইল তাতো গুণিনি ভাই, মায়ের নামে চলে এসেছি। আবার ভোরেই রূপকাঠি পৌঁছুতে হবে।"

কথা কহিতে পারিলাম না। আমাদের গ্রাম হইতে রূপকাঠি অন্ততঃ বিশ মাইল। এই বিশ মাইল পথ এই দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া যে সচ্ছন্দে যাইতে সাহস করে, তাহাকে সাধারণ মানুষ কখনও বলা যাইতে পারে না। বাধা দিলে সে মানিবে না জানিতাম, তথাপি কহিলাম, "রূপকাঠি কি কাল সকালে গেলে

চলবে না?” অমরেশ লাঠিগাছটা তুলিয়া লইয়া কহিল, “তা হয় না সতু। কাল সকালে মিঃ দত্তের বোট রূপকাঠির ঘাটে পৌঁছুবে। তার আগে আমায় গিয়ে পৌঁছুতে হবে। অভ্যর্থনা, সভা, তাঁর আহার-বিশ্রাম সব আয়োজনই আমাকে কর্ত্তে হবে।”

“এক ঘণ্টা জিরিয়ে যাও, বৃষ্টি ধরুক!” আমি কহিলাম।

অমরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার হাত ধরিয়া কহিল, “মনে কিছু করোনা সতু, তোমার কথা রাখতে পারলাম না, ঝড়-বৃষ্টি মানলে চলবে না। ক্লাইভের যে সেনারা বাঙ্গলা জয় করেছিল, তারা মেঘ-বৃষ্টির দিকে চায়নি, চেয়েছিল সম্মুখে। আজ যদি তাদের হাত থেকে দেশকে ফিরিয়ে নিতে হয়, তবে আমাদেরও সামনে চাইতে হবে, উপরে কিংবা পিছনে চাইলে চলবে না। সামনের পথই সোজা পথ।” বলিয়াই অমরেশ বাহির হইয়া নিদাঘ-নিশীথের অন্ধকারে মিশিয়া গেল। বৈশাখী মেঘের গর্জ্জনের সাথে একটি অতি তীব্র স্বর দূর হইতে শুনিতে পাইলাম।

“মায়ের নাম নিয়ে ভাসানো তরী যেদিন ডুবে যাবেরে!”

ইহার পর আর অমরের সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে সকল সংবাদ অমি শুনিয়াছি।

গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অমরেশ দেশসেবা-ব্রতের পুণ্যকথা কীর্ত্তন করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও চরিত্র-মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে লোক যখন উপদেশ লইতে

আসিত, তখন সে মৃদু হাসিয়া কহিত, "আমি কেউ নই। সেবা-ব্রতের দীক্ষা নিতে চাও, তবে আদর্শ পুরুষের শরণ লও।" এইরূপে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া বীজবপনের জন্য সে মিঃ দত্তকে সহর হইতে আহ্বান করিয়া আনিত। এইরূপে বৎসরের মধ্যে অমরেশ মিঃ দত্তকে লক্ষ লক্ষ লোকের রাষ্ট্রীয় গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল।

সহসা একদিন পুলিশ আসিয়া বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে অমরেশকে অপসারিত করিয়া লইয়া গেল। অমরেশ সমবেত বিক্ষুব্ধ জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ভাই সব, আমি চললাম। তোমরা যে ব্রত নিয়েছ, তা জীবন দিয়ে সফল কর! অভাব অভিযোগ প্রয়োজন সব মিঃ দত্তকে জানাবে। তাঁর উপদেশ ও নির্দ্দেশে চলবে, সিদ্ধি নিশ্চয় হবে।"

রাজদ্রোহের অপরাধে অমরেশের তিন বৎসর জেল হইল। অমরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "বন্দেমাতরম্।" জেলে যাইবার পূর্ব্বে একখানি কাগজের টুকরায় মিঃ দত্তের উদ্দেশে লিখিল, "মাকে দেখবেন।" তাহার পর অমরেশ জেলের গাড়ীতে উঠিল। স্বেচ্ছাসেবকেরা জয়ধ্বনি করিয়া ফিরিয়া গেল।

* * * *

দীর্ঘ তিন বৎসর। ইহার মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। দেশ-সেবার ধারা, দেশ-প্রেমের সংজ্ঞা সমস্ত বদলাইয়া গিয়াছে।

নূতন নূতন দল গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের কার্য্য অভিনব, কার্য্যধারা নূতন।

এই নূতন ভাবের আবেষ্টনের মধ্যে একদিন বর্ষার প্রভাতে ক্ষয়কাশির আক্রমণে জীর্ণ দেহ লইয়া অমরেশ জেল হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে পরিচিত কাহাকেও দেখিল না। সহরের এক হোটেলে বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে সে বাড়ী ফিরিল।

ভোরে বাড়ীর দরজায় ঘা দিয়া সে ডাকিল, "মা!" সাড়া আসিলনা। কিছুক্ষণ পরে হুঁকা হাতে নবীন পোদ্দার বাহির হইয়া আসিলেন।

অমরেশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আপনি?" পোদ্দার হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া করজোড়ে নমস্কার করিয়া কহিল, "এজ্ঞে কি— কি করি আর! বামুনের ভিটে মোছলমানে নিলেম ডেকে নেবে তাকি দেখতে পারি? তাই দু'শ আটাশ টাকাতেই নিলাম। তার বড় লাভ হয়নি; দেখুন না, দক্ষিণ পোতার ঘরে একরকম তো কিছু ছিলই না। পুকুরের ঘাটে—"

অমরেশ বাধা দিয়া কহিল, "মা?—"

বৃদ্ধ একটু বিব্রত হইল, তারপর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, "এজ্ঞে তিনি তো ভট্চাজ বাড়ীতে—"

অমরেশ কথা না বলিয়া ভট্টাচার্য্য বাড়ীর পথ ধরিল। পোদ্দারের প্রথম কথাতেই বুঝিয়াছিল যে, পিতার ঋণের দায়ে

বাস্তুভিটা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী আঙ্গিনায় ছড়াঝাঁট দিতেছিলেন, অমরেশকে দেখিয়া ম্লান মুখে কহিলেন, "এস বাবা, কবে এলে?" অমরেশ প্রণাম করিয়া কহিল, "আজই। মা কোথায়?"

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী কহিলেন, "হাত-মুখ ধোও, বিশ্রাম কর।" অমরেশের মনে শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল, সে প্রশ্ন করিল, "মা কোথায়?"

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া অমরেশের প্রশ্নের জবাব দিলেন। অমরেশ করতলে মুখ ঢাকিয়া আচ্ছন্নের মত বসিয়া রহিল।

দ্বিপ্রহরে মায়ের মৃত্যুর কাহিনী অমরেশ সমস্তই শুনিল। পুত্রের কারাদণ্ডের সংবাদ পাইয়া বিধবার মূর্চ্ছারোগের সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিযা পাওনাদারের তাগিদ, অবশেষে বাস্তুভিটা বিক্রয়, শেষে উন্মাদ প্রায় জননীর অন্নজল ত্যাগ এবং মৃত্যু সমস্ত কথাই ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী সবিস্তারে কহিয়া গেলেন। অমরেশ নীরবে শুনিয়া গেল মাত্র।

* * * *

অমরেশ কলিকাতায় আসিয়া দেখিল যে, সে দিনের সে কলিকাতা আর নাই। স্কুল কলেজে পূর্ব্বের মতন ছাত্রেরা যাতায়াত করিতেছে। যে বস্তুটির বিরুদ্ধে তিন-চার বৎসর পূর্ব্বে

নিদারুণ বিদ্রোহ বিচিত্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই কাউন্সিলের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে। যাঁহাদের ত্যাগের আদর্শ তাহাকে একদিন অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহাদের মোটরগাড়ী রীতিমত বেলা দশটায় হাইকোর্টে গিয়া পাঁচটায় ফিরিয়া আসিতেছে।

সঙ্গে সম্বল বিশেষ কিছু ছিল না। শিয়ালদায় এক হোটেলে প্রত্যহ একবেলা খাইয়া সে মিঃ দত্তের সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাঁহার নেতৃত্ব তখন মক্কেলের নিবিড় অরণ্যে ও অগণ্য প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে স্থান লাভ করিয়া দুর্লভ দর্শন হইয়া গেছে, সাক্ষাৎ সহসা মিলিল না।

কিন্তু তাঁহাকে অমরেশের চাই-ই। অর্থ সাহায্যের জন্য নহে, মায়ের মৃত্যুর জবাব দিহির জন্য।

একদিন সুযোগ ঘটিল ; সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে এক পরামর্শ বৈঠকে গিয়া উপস্থিত হইল। আগামী নির্ব্বাচনের জন্য সভা বসিয়াছিল। জোর বিতর্ক চলিতেছিল সহসা অমরেশ প্রবেশ করিয়া তারস্বরে কহিল, "মিঃ দত্ত! বাইরে আসুন!"

মিঃ দত্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। একজন সদস্য উঠিয়া কহিলেন, "তুমি কে হে ছোক্‌রা ? যাও—বেরিয়ে যাও!"

অমরেশ মিঃ দত্তের দিকে চাহিল, তিনি কথা কহিলেন না। রুদ্ধ-আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে অমরেশ বাহির হইয়া আসিল।

হোটেলে ফিরিয়া দেখিল পূর্ব্বের স্কুলের চাকরীতে, পুনরায় ফিরিয়া ভর্ত্তি হইবার জন্য তাহার দরখাস্তখানি প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অমরেশ শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরে চাহিয়া রহিল। বাহিরের রাস্তায় তখন অসংখ্য মোটরকারে স্বেচ্ছাসেবকের দল দেশনায়ক মিঃ দত্তের জন্য ভোট ভিক্ষা করিয়া তারস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া ছুটিতেছিল।

পরদিন কলেজ স্কোয়ারে বিরাট নির্ব্বাচন-সভায় রক্তচক্ষু, জীর্ণ-বেশ, উপবাসী অমরেশ যখন আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মিঃ দত্ত কেবল মাত্র বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বক্তৃতা আরম্ভ হইতেই তীরবেগে ছুটিয়া গিয়া অমরেশ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল,—

"ভণ্ড—প্রতারক—পশু—"

অধীর জনতা রুখিয়া উঠিল, "দেশদ্রোহী গুপ্তচর—"

মুহূর্ত্ত মধ্যে অমরেশের দুর্ব্বল দেহ আঘাতে রক্তাপ্লুত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

পরদিন সবিস্তারে স্বদেশদ্রোহী অমরেশ কর্ত্তৃক দেশনায়কের বধ-চেষ্টার কাহিনী সমস্ত সংবাদপত্রে তীব্র ভাষায় প্রচারিত হইয়া গেল।

দেশদ্রোহী অমরেশ মধ্যরাত্রেই জীবন দিয়া তাহার দেশ-দ্রোহের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়াছিল, কাজেই এ কথার প্রতিবাদ করিবার আর কেহ ছিল না।

শাঁখের করাত

পনের বৎসর পর পশুপতি গ্রামে ফিরিল। এতদিন পাঞ্জাবে খুড়ার কাছে থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছে, গ্রামের খবর বড় জানিত না। সন্ধ্যাকালে গ্রামের প্রধানেরা একত্র হইয়া গ্রামের এই কৃতবিদ্য সন্তানটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, সংক্ষেপে গ্রামের সংবাদ তাহাকে জানাইলেন। সংবাদগুলি এই,—

বিশ সনের ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া জমিদার মধু মিত্র মহাশয় পরলোকে গিয়াছেন। তদীয় পুত্র অনুকূল সম্পত্তি বন্ধক দিয়া বিলাত যাইবার নাম করিয়া, বোম্বাইতে এক সাহেবী হোটেলে আছে।

রায়-বাড়ীতে রায়-গিন্নী আছেন। রায় মহাশয় ওলাউঠায় ও তাঁহার তিন পুত্র মরিয়াছে কালাজ্বরে।

কুণ্ডু-বাড়ীতে কেহ নাই; দুই সরিকে বৎসর দশেক ধরিয়া কাঁঠাল গাছের স্বত্ব লইয়া মামলা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, শেষে এক সরিক বগুড়ায় মামাবাড়ী, অপর সরিক মালদয় মাসীবাড়ীতে গিয়াছে। বাড়ী খালি, তাহাতে বছিরদ্দি চৌকীদারের মুর্গী ও ধনাই দাসের গরু থাকে।

ছেলের অভাবে গ্রামের মাইনর ইস্কুলটি উঠিয়া গিয়াছে। ছেলেরা এক হাফ্ আথড়াইয়ের দল করিয়াছে, কদম বিশ্বাসের

বাড়ীর দরদালানে দুপুরবেলা তাস পিটিয়া, সন্ধ্যাকালে আখড়াই জুড়িয়া দেয়।

গ্রামের মেয়েরা দুপুরে নদীতে এবং সন্ধ্যায় মল্লিকদের এঁদো পুকুরে স্নান করেন। নদীর ঘাটে যাইবার উপায় নাই। নবিগঞ্জের চামড়ার গুদামওয়ালার মুন্সী সরকার আর একদল লোক রংদার লুঙ্গী ও ধোপদস্ত কামিজের উপর ওয়েষ্ট কোট আঁটিয়া মাঝ নদীতে বিশ্রী সারি গাহিয়া বাচ খেলে, কখনও কখনও ঘাটে বসিয়া নির্ভয়ে বিড়ি ফুঁকিতে থাকে।

এই কথা শুনিয়া পশুপতি একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, "আপনারা কি করেন?" নবীন রায় মহাশয় প্রাচীন ব্যক্তি, অনেক দেখিয়াছেন। তিনি কহিলেন, "কি করব দাদা? টাকাই সব। টাকার জোরেই সব হয়। গত বৎসর রাধা বোষ্টমী আর এই বোশেখে মাখন মাঝির জলজ্যান্ত বৌকে ঘাট থেকে তুলে নিয়ে গেল, কে কি করল? টাকায় সাক্ষী বোবা হয়, পুলিশ খোঁড়া হয়। আমরা যদি দু'কথা বলতে যাই, তা হ'লে আর হাটে যাওয়ার পথ থাকে না।" দাশু ঘোষ কহিলেন, "মান-ইজ্জৎ সব মধু মিত্তির মশাইয়ের সঙ্গেই গিয়েছে। জেলেপাড়া নবিগঞ্জের দালালের উৎপাতে সাফ্। বৌ-ঝি ঘরে রেখে জাল বাইতে যাবে কে? ভাবছি এই পোষ পেরুলে ঘর দু'খানা ভেঙ্গে নিয়ে সদরে গিয়ে ঘর তুলব।"

পশুপতি পূর্ব্ববৎ তীব্র স্বরে কহিল, "কোথাও যেতে হবে না!

আমি দু'দিনে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। নিশ্চিন্ত থাকুন! শুধু ছেলেগুলোকে একবার আমার কাছে ডেকে দেবেন।"

(২)

একে বড় মানুষ তাহার পর এম্-এ পাশ; বহুকাল পর দেশে ফিরিয়াছে। ছেলের দল তাহাকে বড় কেহ দেখে নাই; কৌতূহলী হইয়া হাফ্‌আখড়াইয়ের দলশুদ্ধ রাত্রি এক প্রহরে পশুপতির বাড়ীর আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল।

পশুপতি মুগুর ভাঁজিতেছিল। মুগুর রাখিয়া ছেলেদের পরিচয় লইয়া কহিল, "তোমরা বেঁচে থাকতে গাঁয়ে এই সব অত্যাচার হয়! কি কর তোমরা?" দলের নেতা নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বয়স বছর বাইশ, কিন্তু এই বয়সেই সংসারের যাবতীয় অভিজ্ঞতা সে লাভ করিয়া অত্যন্ত প্রবীণ হইয়া পড়িয়াছিল। সে কহিল, "করতে পারি সবই। কিন্তু পিছনে দাঁড়ায় কে বলুন? সব কাজেই টাকা চাই। টাকা পেলে দু'দশটা লাঠিয়াল—"

পশুপতি রুখিয়া উঠিল, "লাঠিয়াল দিয়ে মা-বোনের ইজ্জৎ বাঁচাবে? এ বুদ্ধি পেলে কোথেকে!"

আপনার সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদের সম্মুখে ধমক খাইয়া নরেন্দ্রের নিতান্ত অপমান বোধ হইল। মনের ক্রোধ মনে চাপিয়া মুখে হাসিয়া কহিল, "তা আপনি যখন এসেছেন যা বলবেন করব।"

পশুপতি কহিল, "যা বলবার বলব কাল। যা করতে হবে তাও বলব কাল, বেলা দশটায় এসো।"

"আজ্ঞে আচ্ছা" বলিয়া নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী চলিয়া গেল এবং পথে বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে পার্ষদবৃন্দের দিকে চাহিয়া কহিল, "হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলেন কত জল। কেমন পাঁচকড়ি?"

পাঁচকড়ি সূত্রধর একটু কাষ্ঠ হাসিয়া কহিল, "তা বৈকি প্রভু।"

একপ্রহর রাত্রে পশুশতি একাকী গ্রামের পথে বাহির হইল। তখন হাফ্ আখড়াইয়ের গান পর্য্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত গ্রাম নিঃঝুম। কাহারো বৈঠকখানায় প্রদীপ নাই। মল্লিকদের চণ্ডীমণ্ডপে সারারাত্রি এককালে পাশা চলিত, সে কথা অব্‌ছায়ার মত তাহার মনে ছিল। দেখিল সেখানে গুটিকতক কুকুর জড়াজড়ি করিতেছে, পথে জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ পাইল না, শুধু নদীর ধারে বারোয়ারীতলার বাঁধানো বেলগাছের নীচে নবিগঞ্জের জনকয়েক লোক তাস পিটিতেছিল, আর একজন বাঁশের বাঁশীতে আড়খেমটায় একটি পিলু বাঁরোয়ায় টপ্পা বাজাইতেছিল।

ভোরে বাইক চাপিয়া প্রথমে পশুপতি গেল থানায়। দারোগা বাবু অপাঙ্গে এই নবাগত যুবককে দেখিয়া লইলেন, কিন্তু তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া খুসি হইতে পারিলেন না। পশুপতি তাঁহাকে গ্রামের অবস্থা জানাইয়া পুলিশের কথা কহিতেই দারোগাবাবু কহিলেন, "পুলিশের সাধ্য কি মশাই! সব গাঁয়ের অবস্থাই এই রকম, পুলিশ কর্ব্বে কি? আপনারা লাগুন! সাক্ষী জোগাড়

করুন, আমরা পিছনে আছি। আপনারা নিজেরা কিছু করবেন না, মামলা করলে সাক্ষী জোটাতে পারবেন না; মামলা ফেঁসে গেলে খবরের কাগজে পুলিশকে গালাগাল করবেন!" পশুপতি এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কথা না বলিয়াই সদরের পথ ধরিল। সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া মহাকুমা হাকিমের কুঠীতে সে যখন উপস্থিত হইল, সাহেব তখন বারান্দায় বসিয়া 'ব্রেকফাষ্ট' করিতেছিলেন। পশুপতি কাউদিয়া গ্রামের অবস্থা সংক্ষেপে কহিয়া গেল। সাহেব সদ্যঃ বিলাত হইতে আসিয়াছেন, এই বলিষ্ঠ যুবকটীকে তাঁহার ভালো লাগিল। ইংরাজীতে কহিলে "জানো বাবু, যে মানুষ আপনাকে সাহায্য করে, ভগবান তাকে সাহায্য করেন। তোমার গ্রামের ছেলেদের নিয়ে একটা-'পেট্রোল' আর 'ডিফেন্স পার্টি' গ'ড়ে ফেল; দেখবে আপনি উৎপাত কমে যাবে, গুড্ মর্ণিং!"

পশুপতি ফিরিয়া আসিল। তাহার পূর্ব্ব আদেশ অনুযায়ী ছেলের দল আঙ্গিনায় অপেক্ষা করিতেছিল, পশুপতি তাহাদিগকে কহিল, "আমি কুস্তির আখড়া খুলছি, সেখানে লাঠি খেলাও চলবে, তা ছাড়া সকল রকম খেলার সরঞ্জাম রাখব। তোমাদের সবাইকে আসতে হবে।" ছেলেরা স্বীকার করিয়া চলিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে ঘাটে যাইবার পথে নবীন রায় মহাশয়কে ডাকিয়া পশুপতি কহিল, "প্রায় ক'রে তুলেছি দাদামশাই, দু'দিনে ঠিক ক'রে দেব, ভয় পাবেন না।"

(৩)

বৈকালে পশুপতি সরকার-বাড়ীর দোলমঞ্চের সম্মুখের মাঠের একবুক ঘেঁটুবন সাফ করিতে লাগিল। মাঠ সাফ হইলে পরদিন সেখানে কুস্তির আখড়া বসিল।

নিজের জলপানির সঞ্চিত টাকা নিঃশেষ করিয়া সহর হইতে মুগুর ডাম্বেল প্রভৃতি ব্যায়ামের সর্ব্ববিধ সরঞ্জাম কিনিয়া আনিল এবং দশ টাকা বেতনে একজন লাঠিয়াল শিক্ষক রাখিতেও ক্রটি করিল না। প্রথম দুই-একদিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী হইল না। হফ্ আখড়াইয়ের দলের বড় কেহ আসিল না। কিন্তু ক্রমে যখন ছেলেরা দেখিল যে, চাঁদা দিতে হয় না অথচ পেট ভরিয়া ছোলা আর গুড় খাইতে পাওয়া যায়, তখন নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী শুদ্ধ আসিয়া কুস্তি করিতে লাগিয়া গেল। সপ্তাহখানেক পর একদিন পশুপতি লাঠি ঘাড়ে করিয়া তাহার বাছা বাছা কয়েকটি সাগ্রেদের সহিত নবিগঞ্জ গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে চামড়ার আড়তদারের সঙ্গে পশুপতির কি কথাবার্ত্তা হইল জানি না, কিন্তু সেদিন হইতে সন্ধ্যায় তাঁহার লোকজনের বাচখেলা বন্ধ হইয়া গেল, নদীর ঘাটে বসিয়া বিড়ি ফুঁকিতেও কাহাকে দেখা গেল না।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যায় নদীর ঘাট গ্রাম-বধূদের কলহাস্য ও কঙ্কণ-ঝনৎকারে পুনরায় মুখর হইয়া উঠিতে লাগিল এবং জ্যোৎস্না নিশীথে পল্লী-পথ নিঃশঙ্ক পদসঞ্চারে শব্দিত করিয়া গৃহিণীরা পূর্ব্বের

মতই পুনরায় রায়-গৃহিণীর নৈশ নারী-সভায় যোগদান করিতে থাকিলেন।

সেদিন পশুপতি কি কাজে ঘাটের পথে চলিতেছিল; রায়-গৃহিণী কয়েকটি তরুণী বধূর পুরোবর্ত্তিনী হইয়া সান্ধ্য-স্নান সারিয়া ফিরিতেছিলেন। পশুপতিকে দেখিয়া কহিলেন, "বেঁচে থাক লক্ষী দাদা আমার! তোমার দৌলতে নেয়ে বাঁচ্‌ছি।" তরুণীরা কেহ কথা কহিলেন না, কিন্তু অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে অনেকগুলি চক্ষু যুগপৎ তাহার প্রতি স্নিগ্ধ প্রসন্ন কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিল, পশুপতি তাহা দেখিল এবং রায়-গৃহিণীর আশীর্ব্বাদের উত্তরে নীচু মাথা করিয়া নীরবে ঘাটের পথে চলিয়া গেল।

পশুপতির উৎসাহে ক্রমে ক্রমে দূর গ্রাম হইতে ছেলেরাও আসিয়া তাহার দলে যোগ দিতে আরম্ভ করিল। খুড়া মহাশয় পাঞ্জাব হইতে লিখিলেন, "বেশ করিতেছ, যদি স্থায়ী করিতে পার, তবে একটা কাজের মত কাজ হইবে।" পিতৃব্যের অনুজ্ঞাক্রমে সে বৎসরের ফসল বিক্রয় করিয়া লব্ধ অর্থ তাহার আখড়ার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-কল্পে ব্যয় করিল এবং মোটা মাহিনা দিয়া কলিকাতা হইতে কুস্তি শিখাইবার জন্য ভোজপুরী পালোয়ান লইয়া আসিল।

আখড়ার শিক্ষার্থীর সংখ্যা যখন একশত ছাড়াইয়া গিয়াছে তখন একদিন সহসা পশুপতি দেখিল যে, ভিনগ্রামের জন-ত্রিশেক

ছাত্র অনুপস্থিত। কারণ অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠাইল, তাহারা অনুপস্থিতির কারণ কিছু জানাইল না তবে বলিয়া দিল তাহারা আর আসিতে পারিবে না। পরদিন নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও তাহার দলের জনকয়েক লোককে দেখা গেল না। তাহাদের সকলেরই অসুখ।

অকস্মাৎ এতগুলি লোকের একসঙ্গে অসুখ হইবার কারণ কিছু পশুপতি আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিল না, তবে বুঝিল যে ভিতরে কিছু রহস্য আছে। তৃতীয় দিন প্রভাতে থানা হইতে একজন হাওলদার আসিয়া পশুপতির ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের সংবাদ লিখিয়া লইয়া গেল এবং বৈকালে নবীন রায় মহাশয় পাংশু-মলিন মুখে আসিয়া পশুপতির নিকট শঙ্কিত মৃদুস্বরে যাহা বলিলেন, তাহাতেই সমস্ত রহস্যের উদ্ভেদ হইল।

কয়েকদিন হইতে জন-দুই আগন্তুক গ্রামে ঘোরা-ফেরা করিতেছে। দফাদার আসিয়া সকলকে গোপনে জানাইয়া গিয়াছে যে, কুস্তীর আখড়ায় যাহারা খেলা করে, তাহাদের উপর কড়া নজর রাখিবার জন্য দারোগার উপর হুকুম আসিয়াছে। সংবাদ দিয়া নবীন রায় কহিলেন, "তুমি ভাল কর্ত্তেই এসেছিলে দাদা, কিন্তু আমাদের পোড়া কপালে সইল না, তা' আর কি কর্ব্বে বল?"

পশুপতি কোনো কথা কহিল না।

(৪)

পরদিন আখড়া একেবারে শূন্য হইয়া গেল। পশুপতি তাহার বাছা বাছা সাগরেদের বাড়ীতে নিজেই গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের অধিকাংশই শারীরিক অস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল না। দুই-চারিজন স্পষ্টই জানাইল যে দারোগা-বাবু আখড়ায় যাইতে তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

পরদিন প্রভাতে পশুপতি সদরে গিয়া উপস্থিত হইল। পুরাতন ম্যাজিষ্ট্রেট্ বদ্‌লি হইয়া গিয়াছে ; নূতন যিনি আসিয়াছেন তিনি পাকা সিভিলিয়ান্, তাঁহার গোঁফ ও চুলেও পাক ধরিয়াছে। পশুপতির নাম শুনিয়াই তিনি পরিষ্কার বাঙ্গলায় কহিলেন, "এসব চালাকি ছেড়ে দাও বাবু। কুস্তির আখড়ার নামে ছেলে জড় করে Loyalty undermine করছ তুমি, আমি শুনেছি।"

পশুপতি তীব্র স্বরে কহিল, "মিথ্যা কথা ! গুণ্ডার হাত থেকে গ্রামের লোকজনকে বিশেষ মেয়েদের বাঁচাবার জন্যই আমি ছেলে-দের শিক্ষা দিচ্ছিলাম, তার সঙ্গে পলিটিক্সের কোন সম্বন্ধ নেই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ টেবিলের কাগজের দিস্তায় নাম সই করিতে করিতে বলিলেন, "গ্রামের লোকজনকে দেখবার জন্য গভর্ণমেণ্ট আছে, পুলিশ আছে, তার জন্য তোমার কষ্ট করবার দরকার নেই। অবশ্য তুমি যদি কিছু কর্ত্তে চাও, সে তোমার ইচ্ছা, তবে জানবে গভর্ণমেণ্ট বোকা নন। গুডমর্ণিং।"

পশুপতি ফিরিয়া আসিয়া সেই দিনই তাহার দলবলকে ডাকিয়া পাঠাইল, দুই-একজন ছাড়া কেহ আসিল না। যাহারা আসিল, তাহারাও আখড়ায় যোগ দিতে কোনমতেই রাজী হইল না।

পরদিন সন্ধ্যাকালে কাহারও নিকট হইতে বিদায় না লইয়া ভোজপুরী পালোয়ানের সঙ্গে পশুপতি পাল্কীতে গিয়া উঠিল এবং মুখ ফিরাইয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য সন্ধ্যার তিমিরচ্ছায়ায় অদৃশ্য নির্জ্জন নদীর ঘাটের দিকে চাহিয়া একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

ঘাট নির্জ্জন, কিন্তু শুনিল দূরে কদম বিশ্বাসের বাড়ীর আঙ্গিনায় হাফ্‌আখড়াইয়ের গান আরম্ভ হইয়াছে—

"রমণী পরম রতনো
সুখের শিকলে বাঁধি করহে যতনো।"

আর তাহার সহিত তাল রাখিয়া ওপাড়ে নবিগঞ্জের হাটে মহরমের লাঠি খেলার একুশখানি কাড়া বাজিতেছে এবং কাছেই রঙ্গিণী খেমটাওয়ালীর বাড়ীর বারান্দায় দারোগাবাবুর জড়িত কণ্ঠস্বরে নিধুবাবুর টপ্পা ও তাঁহার সঙ্গীদের অট্টহাস্য ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।

সমাপ্ত